ক্রুসেড-৩০
মহাসমর
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ৩০

মহাসমর

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ৩০

মহাসমর

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

CRUSADE-30

Mohasamar

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

Published on: August 2006

PRICE : ৫০.০০

ISBN 984-581-247-8

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ যাযাবর কন্যা ▼ মহাসমর

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

জেরুজালেম হাত ছাড়া হওয়ার পর পোপ দ্বিতীয় আরবানুসের আহবানে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল সমগ্র খৃস্টান বিশ্ব। তাদের নেতৃত্ব নিলেন জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড। শুরু হলো যুদ্ধের এক মহাযজ্ঞ।
প্রথমেই ময়দানে এলেন জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক। তিনি দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে। তিনি এত বেশী সৈন্য নিয়ে এলেন যে, এক আইয়ুবীকে শায়েস্তা করার জন্য এরচে বেশী সৈন্যের দরকার মনে করলেন না তিনি। তাই অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটকে সঙ্গী বানানোরও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তিনি তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একাই অগ্রসর হলেন এবং বীরদর্পে দামেশকের উপর আক্রমণ করে বসলেন।
কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, তিনি সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধের টেকনিক সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি দুই লক্ষ সৈন্যের দম্ভ নিয়ে সুদূর জার্মানী থেকে ছুটে এলেন আরবের মরুময় ভূখণ্ড দখল করতে। ভাবলেন, আইয়ুবীকে পরাজিত করা, এ আর এমন কি কঠিন কাজ!
দীর্ঘ ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে এ আক্রমণ নিঃসন্দেহে ব্যাপক ও তীব্র ছিল। ঐতিহাসিকরা দামেশকের উপর এই আক্রমণকে ক্রুসেড যুদ্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও সর্বাত্মক আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্রাট ফ্রেডারিক তার বিপুল সৈন্যের দম্ভ নিয়ে ছুটে এলেন। প্রথমেই তিনি টার্গেট করলেন সিরিয়াকে। তিনি সিরিয়ায় এসে কালবিলম্ব না করে দামেশকের ওপর প্রবলবেগে আক্রমণ করে বসলেন। কিন্তু দামেশক কব্জা করা তো দূরের কথা, তিনি দামেশকের একটি ইটও খসাতে পারলেন না।

সম্রাট ফ্রেডারিক তার বিপুল সৈন্য নিয়ে যখন দামেশকের কাছে এসে উপস্থিত হলেন তখন তার ধারনা ছিল, সুলতান আইয়ুবী এই বিশাল বাহিনী দেখে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আত্মসমর্পনের জন্য ছুটে আসবেন। তাই তিনি তার আগমন জানান দেয়ার জন্য প্রথমে দামেশকের ওপর পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালালেন। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা বীর বিক্রমে সে আক্রমণ রুখে দিল।

রাতে ফ্রেডারিকের বাহিনী বিশ্রাম নিচ্ছিল। পরদিন ভোরে নতুন উদ্যমে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মুসলিম বাহিনীর ওপর। তাই রাতের বিশ্রামটা ছিল তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দামেশকের আকাশ রাতের অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনী চুপিসারে বেরিয়ে এলো ক্যাম্প থেকে। এরপর তারা খৃস্টান সেনাবাহিনীর বিশাল ক্যাম্প অতিক্রম করে পৌঁছে গেল যেখানে এই বাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্রসামগ্রী ও যুদ্ধের অন্যান্য রসদপত্র রেখেছিল সেখানে। পাশেই ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। ওখানে ছিল লক্ষ লক্ষ যুদ্ধের ঘোড়া। একদল কমান্ডো চলে গেল সেই

আস্তাবলের পেছনে।

খৃস্টান সৈন্যরা ঘুমিয়েছিল তাদের তাবুগুলোতে। সামান্য কিছু সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল সেই তাবু। রসদ এবং আস্তাবলের ওখানেও পাহারা ছিল, তবে সবকিছুই ছিল ঢিলেঢালা। এতবড় বিশাল বাহিনীর ওপর রাতের অন্ধকারে আইয়ুবীর বাহিনী হামলা করবে এমনটি তারা কল্পনাই করতে পারেনি।

তখনো রাত তেমন গভীর হয়নি। হঠাৎ একযোগে সুলতানের কমান্ডোরা ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই অস্ত্রভান্ডার, রসদসম্ভার ও আস্তাবলের ওপর। তারা এমন তীব্র ও প্রাণপণ আক্রমণ চালালো যে, সামান্য ক'জন পাহারাদার মুহূর্তেই ওরা গায়েব করে দিল। তারপর সেই অস্ত্রসম্ভার ও রসদপত্র তাদেরই ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দামেশকের সেনা ক্যাম্পে আনা শুরু করলো।

শহরের প্রধান ফটকসহ সব কয়টি ফটক খুলে দেয়া হলো। শত শত ঘোড়ার গাড়ী লাইন দিয়ে এসে ঢুকতে লাগলো শহরে। সুলতান আইয়ুবী তার পুরো বাহিনী শহর থেকে বের করে মোতায়েন করলেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, যেনো কমান্ডোদের সরবরাহ কাজে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

এ খবর সম্রাট ফ্রেডারিকের ক্যাম্পে পৌঁছতে দেরী হলো না। তারা দ্রুত তৈরী হয়ে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে ছুটলো গুদামের দিকে। কিন্তু সেখানে তারা পৌঁছতে পারলো না, তার আগেই সুলতান আইয়ুবীর নিয়মিত বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জার্মানীর খৃস্টান সৈন্যদের জন্য মরুভূমি ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। তার ওপর দামেশক ছিল তাদের জন্য অপরিচিত ও নতুন জায়গা। রাতভর তারা লড়াই করলো অনিশ্চিতের মতো। কোথায় শত্রু, শত্রুর পরিমাণ কত, কি তাদের অস্ত্র কিছুই জানা নেই তাদের। তারা এক দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তখন ছুটে আসে ঝাঁক ঝাঁক তীর। সঙ্গীদের কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ে চোখের সামনে, বাকীরা পিছু হটে আত্মরক্ষা করে।

অন্য দল এগুতে গিয়ে দেখে তাদের সামনে তলোয়ার ও বল্লমের দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে আইয়ুবীর সৈন্যরা। তারা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। সহসা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আইয়ুবীর কোন অশ্বারোহী বাহিনী।

অদৃশ্য শত্রুর এই আক্রমণ ফ্রেডারিকের বাহিনীকে তছনছ করে ফেললো। সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো সেনাপতি ও কমান্ডারদের কাছ থেকে। কমান্ডাররা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখলো চারদিকে কেবল অন্ধকার। আকাশের মিটিমিটি অনুজ্জ্বল তারাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত মেঘের আড়ালে।

তারপরও যুদ্ধ হয়। কারণ দুই লক্ষ সৈন্যের এ বিশাল বাহিনীর কাছে সুলতানের বাহিনী যেনো দৈত্যের সামনে লিলিপুট।

খৃস্টানদের অস্ত্র ও রসদসম্ভারেরও কোন কমতি ছিল না। রাতভর লুট করেও যেন কোন কূল পাচ্ছিল না কমান্ডোরা। তারা নিজেদের শৃঙ্খলা অটুট রেখে গাড়ী বোঝাই করে দ্রুত এবং ক্রমাগত মালসামান শহরের অভ্যন্তরে পাঠাতেই থাকলো।

কমান্ডোরা বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল বিভিন্ন গুদাম। যারা অস্ত্র লুট করছিল তারা কেবল অস্ত্রই লুট করতে থাকে। যারা গোলাবারুদ তুলছিল তারা গাড়ীর পর গাড়ী বোঝাই করছিল কেবল গোলাবারুদ দিয়ে। আরেক দল খাদ্য সামগ্রী লুট করার কাজে ব্যস্ত রইলো।

সম্রাট ফ্রেডারিকের ঘোড়ার গাড়ীর পরিমাণ ছিল অজস্র। পরিমাণে তা এতই বেশী যে, সবকটা ঘোড়ার গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে চালানোর মত সৈন্যও পাওয়া গেল না আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীতে।

তারা গাড়ী শহরে ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ী রেখে খালি ঘোড়া নিয়ে ছুটে যেতো গুদামে। ওখানে নতুন গাড়ীতে আগেই মাল ভরে রাখতো অন্যরা। তারা ঘোড়া রেখে নতুন ঘোড়া ও নতুন গাড়ী নিয়ে ছুটতো শহরের দিকে।

এই ব্যস্ততার মধ্যে কোন ফাঁকে রাত শেষ হয়ে গেল টের পেল না আইয়ুবীর বাহিনী। তারা তখনো গাড়ী বোঝাই করে অস্ত্র ও খাদ্যসম্ভার শহরে আনছিল, দেখতে পেলো পূর্ব দিগন্তে আলোর আভাস।

সম্রাট ফ্রেডারিকের সৈন্যরা গজবের একটি রাত পার করলো। তাদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে উঠে এলো ভোরের নতুন সূর্য।

ফ্রেডারিকের বাহিনী তখন এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন। অনিশ্চিত দুঃস্বপ্নের ঘোর তাদের চোখে মুখে। শোচনীয় পরাজয়ের কালিমা নিয়ে ফ্রেডারিক তার বাহিনীকে পিছিয়ে নিয়ে নতুন করে সংগঠিত করলেন।

তিনি দেখতে পেলেন, বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পরও বিশাল বাহিনী বলে ঘাটতিটা তেমন চোখে পড়ে না। ময়দানে এখনো তার বিপুল সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। কিন্তু তাদের মুখে দেয়ার মত খাদ্য নেই তার হাতে।

তিনি পিছু হটে এক স্থানে ক্যাম্প করে নতুন করে যুদ্ধের প্ল্যান করা শুরু করলেন। কিন্তু অচিরেই টের পেলেন, তার বাহিনীতে কেবল খাদ্য নয়, পানিরও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোর নিয়ন্ত্রণ তখন মুসলিম বাহিনীর হাতে। ফলে তারা কোথাও থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারছে না। নানা বিপদাপদ ও উৎকন্ঠার মধ্যে দিনটি কেটে গেল। ঝুপ করে তাদের সামনে নেমে এলো আরেকটি ভয়ংকর রাত। ক্যাম্প অরক্ষিত রেখে ঘুমোতে যাওয়ার কথা ভাবতে পারলো না কেউ।

একদল ঘুমোবে আরেক দল জেগে পাহারা দেবে ক্যাম্প, এসব যখন ভাবছিল খৃস্টান বাহিনীর সেনাপতি ও কমান্ডাররা, তখনি সৈন্যদের মাঝে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা শুনতে পেলো দূর থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত ঘোড়ার সম্মিলিত খুরধ্বনি।

২২ জিলহজ্জ ৫৮৬ হিজরীর দিবাগত রাত। মুসলিম কমান্ডোরা প্রচন্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো সম্রাট ফ্রেডারিকের বাহিনীর ওপর। তাদের বিদ্যুৎগতির আক্রমণে তছনছ হতে লাগলো খৃস্টান বাহিনীর ক্যাম্প। ওখানে শুরু হয়ে গেল আহতদের আর্তচিৎকার, ভীত সন্ত্রস্ত সৈন্যদের কান্নাকাটি ও শোকের মাতম।

খৃস্টান বাহিনী যতটা না প্রতিরোধ করছিল তারচে বেশী করছিল বিলাপ। কমান্ডোরা কোথাও থমকে না দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটছিল নাঙ্গা তলোয়ার হাতে। এবার আর তাদের নজর সম্পদ বা অস্ত্রের দিকে ছিল না। এবার তারা কচুকাটা করছিল সম্রাট ফ্রেডারিকের বীর সৈন্যদের।

জার্মানীর সৈন্যরা ক্যাম্পের চারপাশে এবং ক্যাম্পের মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় শুকনো কাঠের খড়ি একত্রিত করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। এতে সুবিধা হচ্ছিল দু'পক্ষেরই, আক্রান্ত হওয়ার আগেই ওরা দেখতে পাচ্ছিল মুসলিম কমান্ডোদের, আবার কমান্ডোরাও দেখেশুনে আঘাত হানতে পারছিল। খৃস্টানদের জ্বালানো অগ্নিকুন্ডগুলো দেখে বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, সমস্ত ক্যাম্পই জ্বলছে।

থেকে থেকে হামলা করছিল মুসলিম কমান্ডোরা। দ্রুতগতির ঘোড়া নিয়ে ঢুকে পড়ছিল ক্যাম্পের ভেতর। কেউ বাঁধা দিতে এলেই মৃত্যু জাপটে ধরতো তাকে।

আহত খৃস্টান সৈন্যদের চিৎকারে নরক গুলজার হয়ে উঠলো ক্যাম্পের পরিবেশ। মরুভূমির রাতের বাতাস ভারী হয়ে উঠলো সে কান্না ও বিলাপের ধ্বনিতে। তাদের নিয়ে চলছিল ছুটাছুটি, চিকিৎসা ও ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ।

পরদিন ভোর। জার্মান সেনাকমান্ড তার সৈন্যদের আরো পিছিয়ে নিলেন। তিনি তার সৈন্যদের সামলে নিয়ে সরে গেলেন বেশ খানিকটা দূরে।

ওখানে কাছেই পাওয়া গেল ছোট্ট একটা গ্রাম। তাতে খাবার

তেমন না মিললেও পানির অভাব দূর হয়ে গেল। তিনি ওখানেই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি জানতেন, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড শিঘ্রই বিপুল সৈন্য নিয়ে চলে আসবেন আইয়ুবীকে শায়েস্তা করতে। তারা সমুদ্র পথে নৌবহর নিয়ে আসছেন। তিনি তার সৈন্য দামেশক থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন দূরে। অপেক্ষা করতে লাগলেন সম্রাট ফিলিপ ও সম্রাট রিচার্ডের জন্য।

কিছুদিন পর। সম্রাট ফিলিপ ও রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে তিনি ক্রমেই নিজের বাহিনীকে দামেশক থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, বসে না থেকে কাছের শহর আক্রা দখল করে নিলে কেমন হয়!

দামেশক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি নজর দিলেন ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহর আক্রার দিকে। ফ্রেডারিক তার বাহিনীকে আক্রার দিকে অভিযান চালানোর আদেশ দিয়ে ভাবলেন, আক্রা দখল করতে পারলে পা রাখার মত একটা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে।

ফ্রেডারিক যখন দামেশক আক্রমণ করেন তখন সুলতান আইয়ুবী দামেশক ছিলেন না। তার অনুপস্থিতিতেই সেখানকার কমান্ডোরা তাকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল।

সুলতান তখন অবস্থান করছিলেন আক্রাতে। তিনি তাঁর সেনাপতি ও সীমান্ত রক্ষীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, 'যদি

কেউ আক্রা আক্রমণ করতে আসে তবে তাকে বাঁধা না দিয়ে সামনে এগুতে দেবে। আক্রা সীমান্ত পেরিয়ে তারা যেন নির্বিঘ্নে শহরের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।'

সুলতানের নির্দেশ অনুসারে ফ্রেডারিকের বাহিনীকে প্রতিরোধ না করে বরং তাদের বিনা বাঁধায় সামনে এগিয়ে যেতে দিল সীমান্ত রক্ষীরা। ফ্রেডারিকের বাহিনী এগিয়ে আসছে খবর পেয়েই তারা সরে গেল পথ থেকে।

বাঁধা না পেয়ে আক্রার সীমান্তের বেশ ভেতরে ঢুকে গেল. ফ্রেডারিকের বাহিনী। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগ পিছু নিল তাদের। তারা ফ্রেডারিকের বাহিনীকে অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ করতে লাগলো এবং ঘন্টায় ঘন্টায় কাসেদ পাঠাতে লাগলো সুলতানের কাছে।

এবার শুরু হলো সুলতান আইয়ুবীর বিশেষ পদ্ধতির যুদ্ধ। সীমান্ত থেকে আক্রা শহর পর্যন্ত সারা রাস্তায় তিনি তার কমান্ডো বাহিনী ছড়িয়ে রেখেছিলেন। একাধিক কমান্ডো বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছিল এ পথটুকু। তাদের প্রত্যেকের জন্য ছিল নির্দিষ্ট এলাকা। সুলতানের আদেশ পায়নি বলে তারা কেউ আক্রমণ করতে পারছিল না ফ্রেডারিকের বাহিনীর ওপর, তবে ফ্রেডারিকের প্রতিটি কদমে তারা নজর রাখছিল।

আক্রার শহর তখনো বেশ দূরে। এক রাতে বিশ্রামের জন্য ক্যাম্প করেছে সম্রাট ফ্রেডারিকের বাহিনী। প্রতি দিনের মত রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে সৈন্যরা।

মাঝ রাতের দিকে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসলো

সুলতানের একদল কমান্ডো। আক্রমণটা তারা করেছিল ফ্রেডারিকের বাহিনীর লেজের দিকে। এই আক্রমণ লেজের দিকের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করে দিল মূল বাহিনী থেকে। তারপর সেই অংশটি নিঃশেষ করে দিল।

কমান্ডোদের লক্ষ্য ছিল শত্রু বাহিনীর শেষ অংশের উপর। প্রথম রাতের পর দ্বিতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটলো। দিনে কোন সৈন্যের ছায়াও দেখতে পায় না খৃস্টান বাহিনী কিন্তু রাতের বেলা আক্রান্ত হয় তাদের বাহিনীর পিছন দিকটি। অদৃশ্য গেরিলারা কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে গায়েব করে দেয় সম্রাট ফ্রেডারিকের বিশাল বাহিনীর একটা নির্দিষ্ট অংশ।

এভাবেই ঘটতে থাকলো ঘটনা। রাতে যখন জার্মান বাহিনী কোথাও ক্যাম্প করতো, তখন সুলতানের কমান্ডো বাহিনী আক্রমণ করতো তাদের। দু'দিনেই শিক্ষা হয়ে গেল ফ্রেডারিকের। তিনি বাহিনীর পেছনের অংশ শক্তিশালী করলেন।

কিন্তু দেখা গেল এবার বিপর্যয় আসছে অন্যদিক থেকে। কমান্ডোরা এবার খৃস্টানদের তাবু লক্ষ্য করে ছোট মেঞ্জানিক দিয়ে পেট্রোল হাড়ি ও সলতেওয়ালা তীর বর্ষণ করতে শুরু করলো। এতে জার্মান বাহিনীর সেনা ক্যাম্পে আগুন ধরে গেলো। নিহত ও আহত হলো ঘুমন্ত সৈন্যরা।

পরদিন ফ্রেডারিক ভাবলেন, থাক আর সামনে এগিয়ে কাজ নেই। তিনি সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো আইয়ুবীর কমান্ডোরা।

তিনি থেমে গেলেন, থেমে গেল আক্রমণও। আবার তিনি রওনা হতে চাইলেন পেছন দিকে, আবারও বাঁধার সম্মুখীন হলেন। এভাবে যত বার তিনি ফিরে যাওযার উদ্যোগ নিলেন ততোবারই তিনি বাঁধার সম্মুখীন হলেন।

এরপর তিনি পেছনে ফেরার চিন্তা বাদ দিয়ে আবার সামনে অগ্রসর হওয়া শুরু করলেন। এভাবেই জার্মান বাহিনী একদিন আক্রা শহরের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলো।

জার্মান সেনাদল যখন আক্রা পৌঁছলো তখন ফ্রেডারিক দেখতে পেলেন, তার সৈন্য সংখ্যা কমে গিয়ে বিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। তাদের সৈন্য বাহিনী যখন পবিত্র ভূমিতে পদার্পন করেছিল তখন তাদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। এখন তার মধ্য থেকে এক লক্ষ আশি হাজারই নেই।

তবে তার একলক্ষ আশিহাজার সৈন্যের সবাই যে মারা গিয়েছিল তা নয়। প্রথমে দামেশক আক্রমণের সময় জার্মানীর বিশাল বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর সেখান থেকে পিছু হটার সময় ক্ষুধা পিপাসার শিকার হয়ে মারা যায় অনেকে। কিছু মারা যায় অসুখ বিসুখে। এই বিপর্যয় সৈন্যদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দামেশক থেকে ফেরার পথে এইসব ভীত সৈন্যদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পালিয়ে যায় প্রাণের মায়ায়। এরপর যারা সম্রাট ফ্রেডারিকের সঙ্গে ছিল আক্রা আসার পথে সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীর তীর ও মেঞ্জানিকের নিক্ষেপিত পেট্রোল হাঁড়ির প্রজ্জলিত আগুনে পুড়ে মারা যায় বাকীরা।

যে বিশ হাজার সৈন্য আক্রা গিয়ে পৌঁছেছিল তারাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। তাদের চোখের সামনে ভাসছিল এক বিশাল বাহিনী, যে বাহিনীর গর্বিত অংশ মনে হতো নিজেকে। সেই বাহিনী ছোট হতে হতে এখন এমন এক ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়েছে, যা দেখে আশাভঙ্গের বেদনায় মুষড়ে পড়লো তাদের অন্তরগুলো। এতে তাদের মন থেকে ক্রুশের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি ক্রুশের প্রতি তারা যে শপথ করেছিল সেই শপথের কথা স্মরণ করার কথাও ভুলে গেল তারা।

•

ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাষ্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড সমুদ্র পথে ধেয়ে আসছে, এ খবর আগেই সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা পৌঁছে দিয়েছিল সুলতানকে। তারা জানালো, ইংল্যান্ডের সৈন্য এরই মধ্যে সাইপ্রাসে এসে গেছে।
এই বাহিনীর সংখ্যা কত সে কথাও গোয়েন্দাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন সুলতান। তারা জানালো, ইংল্যান্ডের সৈন্য সংখ্যা ষাট হাজারের মত হবে। ফ্রান্সের সৈন্য সংখ্যাও প্রায় সমপরিমাণ। এদিকে আক্রায় অবস্থান করছিল জার্মানীর বিশ হাজার সৈন্য। জেরুজালেম ও আশপাশের খৃস্টান সম্রাটদের সৈন্যরাও যুদ্ধ বাঁধলে তাদের সাথে শামিল হবে এতে সন্দেহ নেই। সুলতান আইয়ুবী ভেবে দেখলেন, খৃস্টানরা চাইলে তার বিরুদ্ধে এযাবত কালের সবচাইতে বড় সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পারবে সন্দেহ নেই।

সুলতান আইয়ুবী আরো খবর পেলেন, গে অব লুজিয়ান, যিনি সুলতানের সঙ্গে আর কখনো যুদ্ধে শামিল হবেন না এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তিনিও কাউন্ট কোনর্যাডকে সঙ্গে নিয়ে পৃথক একটি বাহিনী গড়ে তুলেছেন।

ইতিমধ্যেই এই বাহিনীতে শামিল হয়েছে সাতশো দুর্ধর্ষ নাইট যোদ্ধা, নয় হাজার ফিরিঙ্গী সৈন্য ও বারো হাজার ওলন্দাজ সৈন্য। কিছু ইউরোপীয় সেনা অফিসারও যোগ দিয়েছে এই বাহিনীতে। এভাবে তার সৈন্য সংখ্যাও বাইশ হাজারে দাঁড়িয়ে গেছে।

ছোট ছোট খৃস্টান সম্রাটরাও আইয়ুবীর বিরুদ্ধে এটাকে চূড়ান্ত যুদ্ধ গণ্য করে তাদের বাহিনী পাঠাতে শুরু করলো সম্মিলিত বাহিনীতে। মোটামুটি হিসেবে সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে ছয় লক্ষ।

শুধু সৈন্য সংখ্যা নয়, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম সব দিক থেকেও ইসলামী সৈন্যদের তুলনায় তারা আশাতীত রকমের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ফলে এবার সুলতানকে পরাজিত ও নিঃশেষ করা সম্ভব হবে এ ব্যাপারে খৃস্টানদের মনে কোন সন্দেহ রইলো না।

অন্যদিকের চিত্র ছিল খুবই করুণ। সুলতানের সৈন্যরা অধিকাংশই ছুটিতে বাড়ী চলে গেছে। সুলতান আইয়ুবীর সাথে আছে তখন মাত্র দশ হাজার মামলুক সৈন্য।

যদিও এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বিশেষ করে

সুলতানের কাছে যুদ্ধের ট্রেনিং পেয়ে নিজেদের ওপর ছিল তারা পূর্ণ আস্থাশীল, কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে এটা এতই অপ্রতুল যে, এরা কোন হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। তবু এদের উপর সুলতানের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করতেন, নিবেদিতপ্রাণ দশ হাজার সৈন্য অনায়াসে এক লাখ সৈন্যের মোকাবেলা করে বিজয়ী হতে পারে।

যুদ্ধের জন্য ভৌগলিক কারণে আক্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখান থেকে স্থলপথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ তেমনি সমুদ্র পথ ব্যবহারেরও রয়েছে অবাধ সুযোগ।

আক্রা শহরে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার। এ সৈন্যের পরিমাণ বাড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না যে, ছুটি প্রাপ্ত প্রতিটি সৈনিককে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নেবেন। তার সৈন্য বাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছড়িয়ে আছে বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। সুলতানকে ওসব অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করে রাখতে হয়েছে এ জন্য যে, ওসব জায়গা থেকে সৈন্য সরালেই তা খৃস্টানরা পুনরায় দখল করে নেবে।

সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাসে তাঁর যে বাহিনী আছে তাদের কথা স্মরণ করলেন। ওখান থেকেও কোন সৈন্য সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই। ওখান থেকে সৈন্য সরালেই তা আবার দখল করে নেবে ক্রুসেডাররা। সুলতান খবর পেয়েছেন,

ক্রুসেড বাহিনী শহরের চারদিকে একত্রিত হচ্ছে।
সুলতান আইয়ুবী মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। জেরুজালেমের পতনকে বিশ্বের খৃস্টান সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্বের জন্য এক মহা হুমকি বলে গণ্য করছিল। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সারা দুনিয়া থেকে খৃস্টানরা এসে একত্রিত হচ্ছিল এই মহাসমরে।
সুলতানের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ হানার জন্য যেখানে সমবেত হচ্ছে লাখ লাখ খৃস্টান সৈন্য, সেখানে সুলতান তার নিজের কোন শহর বা কেল্লা থেকেই কোন সৈন্য সংগ্রহ করতে পারছেন না।
অপরদিকে ধেয়ে আসছে ইংল্যান্ডের বিশাল নৌবহর। এ বাহিনী কেবল শক্তিশালী নয়, ভয়ংকরও। সুলতান আইয়ুবী ভালভাবেই জানেন, মিশরীয় নৌবহর দিয়ে ইংল্যান্ডের এ বিশাল নৌবাহিনীর সাথে কোনভাবেই মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।
সুলতান আইয়ুবীর জন্য এ মহা সমস্যা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। তিনি জানেন, এ সমস্যার মোকাবেলা তাকে করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে মোকাবেলা করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। এ যে বড় অসম সংঘাত!
অনেকগুলো বিজয় অর্জন করার পরও সুলতানের জন্য সময়টা এখন খুবই খারাপ। বিগত চারটি বছর তাঁর সৈন্যরা একটানা যুদ্ধ করেছে। তাঁর বিশ্বস্ত ও সদা তৎপর কমান্ডো বাহিনীও দীর্ঘদিন ধরে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, মরুভূমিতে জীবন বাজী

রেখে ক্রমাগত লড়াই করে আসছে। এ সব লড়াইয়ে তারা তাদের জীবন অকাতরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করলে এবং তাদের শারীরিক অবস্থা বিচার করলে তারা আর যুদ্ধ করার উপযোগী নেই। এখন তাদের প্রয়োজন একটু বিশ্রাম, একটু প্রশান্তির জীবন।

সুলতান ভাবছেন, শুধু ধর্মীয় আবেগের কারণে তাদের মধ্যে যে ভালবাসার শক্তি বিরাজ করছে, তাকে সম্বল করে এই অল্পসংখ্যক ও রণক্লান্ত সৈন্যকে ক্রুসেড বাহিনীর ছয় লাখ তরতাজা সৈন্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়াটা কি আত্মহত্যার নামান্তর নয়?

এ মহা সমস্যায় পড়ে সুলতান আইয়ুবীর অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, তিনি আর রাতে ঘুমাতে পারতেন না। তিনি সব সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। যুদ্ধের নতুন কৌশল উদ্ভাবন, ময়দানের নতুন নকশা আঁকা এসব কাজে তিনি এত বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়লেন যে, তাঁর শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। দেখতে দেখতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে গেলে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁকে নিয়মিত অষুধ পথ্য দিতে লাগলেন। এভাবে কেটে গেল তিন চার দিন। চার দিন অসুখে থাকার পর তিনি ডাক্তারের সেবাযত্নে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু শরীরে আগের মত বল বা শক্তি পাচ্ছিলেন না।

তার বয়স এখন ৫৪ বছর। কিশোর কালে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছিলেন। সারাটা যৌবন তিনি কাটিয়েছেন

যুদ্ধের ময়দানে। দুর্গম পাহাড়, গভীর জঙ্গল, কঠিন মরুভূমি সর্বত্র একের পর এক যুদ্ধ করে তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন সারাটা জীবন। বিজয়ের পর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। কিন্তু শেষ বয়সে এমন কঠিন বিপদে পড়বেন, কল্পনাও করেননি তিনি।

তার মনে পড়ে গেল, কৈশোরে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের কসম খেয়েছিলেন। সে কসম তিনি পূর্ণ করেছেন। তারপর তিনি মসজিদুল আকসার মিম্বর ধরে শপথ করেছেন, 'বেঁচে থাকতে আমি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইসলামী পতাকা সরতে দেবো না।' এ শপথের কথা স্মরণ করেই তিনি এখন ঘুমোতে পারেন না। বিশ্রাম সারা জীবন তার জন্য হারাম ছিল, এখনো হারাম হয়েই রইলো।

আমেরিকান ঐতিহাসিক এ্যান্থনী জুলিয়েট, হেরাল্ড লিম, লেনপোল, গীবন, আর্নল্ড প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী সামান্য সুস্থ হয়েই বললেন, 'আমাকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে চলো।'

তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও জিন্দাদীল সেনাবাহিনীর দশ হাজার সৈন্য আক্রায় রেখেই বায়তুল মোকাদ্দাসে রওনা হলেন। সঙ্গে নিলেন কেবল নিজের রক্ষী বাহিনী।

সৈন্যদের বললেন, 'আক্রার জিম্মা আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি শপথ নিয়েছিলাম, বেঁচে থাকতে বায়তুল মোকাদ্দাসের ইসলামী পতাকা আমি অবনমিত হতে দেবো না। খৃস্টানরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের সাথে মোকাবেলা করতে আসছে।

আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে তাদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলা করার জন্য চলে গেলাম। বিজিত প্রতিটি অঞ্চলের হেফাজতের জিম্মা পালন করবে নিজ নিজ এলাকার মুজাহিদ বাহিনী। আক্রা যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তোমাদের জীবন থাকতে এখানে ক্রুশের পতাকা উড়বে এ কথা আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না।'

তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস রওনা হয়ে গেলেন। কমান্ডো বাহিনীকে আগেই জানানো হয়েছিল, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস রওনা হয়েছেন। তারা তাঁর জন্য আক্রা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিরাপদ করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিল। সুলতান আইয়ুবী নির্বিঘ্নে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি সোজা গিয়ে মসজিদুল আকসায় উঠলেন। সেখানে সিজদায় পড়ে ছেড়ে দিলেন চোখের পানি। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি করে বলতে লাগলেন, 'হে আমার খোদা! আমাকে এমন ভয়াবহ সংকট মুহূর্তে তোমার গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য করো। তোমার সৈনিকরা আজ এক কঠিন বিপদের মুখোমুখী। আমাদের আর কোন সহায় নেই যার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি।
তুমি আমাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করো। তুমি আমাদের এমন ক্ষমতা দাও যাতে আমরা তোমার দ্বীনের দুশমনদের রুখে দিয়ে তোমার বান্দাদের নিরাপত্তা দিতে পারি, তোমার দ্বীনকে হেফাজত করতে পারি।'

এভাবে তিনি কেঁদে কেঁদে আল্লাহর সাহায্য চাইতে লাগলেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি সারা দিন মসজিদে পড়ে অঝোরে কান্নাকাটি করলেন।

সন্ধ্যার পর তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন তাঁর মুখে ছিল প্রশান্তি। মনে হচ্ছিল, যে দৃঢ়তা ও মনোবল নিয়ে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করেছিলেন, তার চেহারায় আবার ফিরে এসেছে সেই দৃঢ়তা।

রাতে সুলতান আইয়ুবী আবার মসজিদুল আকসায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন এবং অশ্রু ভেজা কণ্ঠে খোদার সাহায্য চেয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। তিনি সারা রাত নফল ইবাদত ও দোয়া দরুদ পাঠ করে ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন।

সেই রাতেরই ঘটনা। রাতে তিনি যখন মসজিদে গিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছিলেন তখন মসজিদের এক কোণে এক ব্যক্তি সারা শরীর কম্বলে ঢেকে ইবাদত বন্দেগী করছিল। সুলতান সারা রাত মসজিদে অবস্থান করেন এবং এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে কাটিয়ে দেন নির্জন প্রহর। সেই লোকও সারা রাত মসজিদে অবস্থান করলো এবং এবাদত বন্দেগী করে সময় কাটিয়ে দিল।

তার ইবাদতের নিজস্ব কোন নিয়ম কানুন ছিল না। মনে হচ্ছিল লোকটি সুলতানকে অনুসরণ করছে। সুলতান সিজদায় গেলে সেও সিজদায় যায় আবার সুলতান মোনাজাতে বসে গেলে

দেখা যায় সে লোকও দু'হাত তুলে মোনাজাত করছে। সুলতান নামাজে দাঁড়ালে সেও নামাজে দাঁড়িয়ে পড়তো। সুলতানকে অজিফা আওড়াতে দেখলে সেও অজিফা আওড়াতে শুরু করতো।

লোকটা মসজিদে এসেই মুসল্লীদের থেকে দূরে গিয়ে বসেছিল। এশার নামাজের সময়ও দেখা গেল লোকটি তার চেহারা কম্বলে ঢেকে মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। এতে কৌতুহল জাগলো সুলতানের রক্ষীদের। তারা দূর থেকে লোকটির দিকে নজর রাখতে শুরু করলো।

সকালে মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিলেও লোকটি তার অবস্থান থেকে নড়লো না। ওখানে দাঁড়িয়েই সে ফজরের নামাজ পড়লো। তারপর সুলতান মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলে সেও নিজেকে কম্বলে জড়িয়ে রেখে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো।

লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলো। এ সময় এক গোয়েন্দা পিছু নিল তার। লোকটি টের পেয়ে পথের ওপর থেমে গেল। দেখাদেখি থেমে গেল গোয়েন্দাটিও।

কম্বলওয়ালা যখন নিশ্চিত হলো, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে তখন সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং অনুসরণকারীকে দাঁড়াতে দেখে তার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল। কিন্তু কি মনে করে সে আবার থমকে দাঁড়ালো এবং উল্টো দিকে ফিরে দ্রুত হাঁটতে লাগলো।

তার পিছু নেয়া লোকটিও দ্রুত হাঁটতে লাগলো। রাস্তার পাশে সামনে এক লোক দাঁড়িয়েছিল। কম্বলওয়ালা তার কাছে গিয়ে

থামলো এবং তাকে কিছু বলে সামনে চলে গেল। ওই লোকটি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

অনুসরণকারী গোয়েন্দা সে লোকটির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ লোকটি কে, যার সাথে তুমি কথা বললে?'

'ও তুমি!' সে লোকটি বললো, 'তুমি তাকে অনুসরণ করছিলে?'

'আমি তার পা দেখেছি।' অনুসরণকারী বললো, 'এ লোক পুরুষ নয়, মহিলা। এই মহিলা কি তোমার আত্মীয়া? তুমি তাকে কিভাবে চেনো?'

দাঁড়ানো লোকটি অনুসরণকারী গোয়েন্দার পূর্ব পরিচিত ছিল। তারা পরস্পরের নামও জানতো।

'বন্ধু এহতেশাম!' সে লোক বললো, 'আমি জানি তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করছো। প্রত্যেকের ওপর দৃষ্টি রাখা তোমার দায়িত্ব। আর বন্ধু হিসেবে আমারও কর্তব্য কোন কিছু গোপন না করে তোমাকে সব বলে দেয়া। আচ্ছা বন্ধু, বলতো, একটি মেয়ের মসজিদে যাওয়া কি পাপ?'

'না, মোটেই নয়।' এহতেশাম বললো, 'এই মহিলা নিজেকে কম্বলে ঢেকে রেখেছিল। তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল ওর ওপর। ওর দিকে নজর রাখতে গিয়েই টের পেলাম সে পুরুষ নয়, মহিলা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর আমার কৌতুহল আরো বেড়ে গেল।

শোন আল আস! সারা রাত আমরা তিনজন বায়তুল

মোকাদ্দাসের আশপাশে পাহারা দিয়েছি। কারণ কাল রাতটি সুলতান মসজিদেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, আমরা ছদ্মবেশে তার হেফাজতের জন্য পাহারা দিয়ে যাচ্ছি।'

এহতেশাম বললো, 'সুলতান কাউকে কিছু না জানিয়েই মসজিদে চলে এসেছিলেন। তার ধারণাই নেই যে, তার নিজস্ব রক্ষী বাহিনী ছাড়াও, কোন লোক তাঁর হেফাজতে নিযুক্ত আছে। এটা হাসান বিন আবদুল্লাহর ব্যবস্থা। তুমি নিজেও সেনা কমান্ডার এবং আমাকে ভাল করে জানো। সে জন্যই তোমাকে সব বললাম। এখন বলো তো, মেয়েটি-কে?'

'অবশ্যই বলবো এহতেশাম।' আল আস উত্তরে বললো, 'বায়তুল মোকাদ্দাসে, বিশেষ করে মসজিদুল আকসার এত কাছে দাঁড়িয়ে কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। হাঁ, আমি অবশ্যই তোমাকে বলবো, এ মেয়েটি কে? কিন্তু তুমি বলো তো, এ মেয়ের ওপর তোমার সন্দেহ হলো কেন?'

'আমি রাতে তাকে বারান্দার এক কোণে বসে থাকতে দেখলাম।' এহতেশাম উত্তর দিল, 'সুলতানের নিরাপত্তার কথা ভেবে মনে করলাম, তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেই। কিন্তু তখন এশার সময় হয়ে যাওয়ায় তাকে আর কিছু বললাম না। নামাজ শেষে সেখান থেকে তার চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সবাই বাসায় ফিরলেও সে বাইরে বের হলো না।

সে সময় সুলতান আইয়ুবী ভেতরে মিম্বরের সামনে ইবাদত বন্দেগীতে ব্যস্ত ছিলেন। আমি দেখলাম তিনি অজিফা পাঠ করছেন। কম্বলে ঢাকা লোকটি সুলতান আইয়ুবীর উপর হত্যার

আক্রমণ চালাতে পরে সন্দেহ থাকলেও মসজিদ থেকে কাউকে তো বের করে দেওয়া যায় না! তাই আমি তাকে কিছু বলতে পারলাম না।

আমি খেয়াল করে দেখলাম, লোকটার ইবাদতের নিজস্ব কোন ধরন নেই। সে সুলতানকে অনুসরণ করে যাচ্ছে মাত্র।

আমি আমার সাথীদেরকে তার কথা বললাম। তারাও মসজিদের ভিতরে ঢুকে তাকে দেখে নিল। সাথীরা বললো, 'এর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।'

রাত বাড়তে লাগলো কিন্তু সে লোক সেখান থেকে উঠলো না। শেষে আমি তার পিছনে বসে গেলাম। আমি তার ক্রন্দন ও ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি তার আরো কাছে সরে বসলাম। ক্রন্দনের সাথে সে যে প্রার্থনা করছিল আমি সে কথাও শুনতে পেলাম। সে তার গোনাখাতার জন্য মাফ চাচ্ছিল আর ক্রুসেড বাহিনীর পরাজয় ও ধ্বংসের প্রার্থনা জানাচ্ছিল।

সে তার এবাদতে এতই নিমগ্ন ছিল যে, তার অতি কাছে একজন বসে আছে সে চেতনাও তার ছিল না। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না, তাকে নিয়ে কি করবো।

এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝেই রাত কেটে গেল। সকালে ফজরের আজান হলো। নামাজের পর সুলতান বেরিয়ে যেতেই সেও বেরিয়ে পড়লো। তখন তার প্রতি আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল।

আমি সব সময় তার উপর দৃষ্টি রাখছিলাম। লোকটি মসজিদ

থেকে বেরিয়ে আসার সময় কম্বলের নিচে তার পা দেখা যাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য তার হাতও দেখতে পেলাম আমি। সে তাড়াতাড়ি তা কম্বলে ঢেকে নিলে আমি টের পেলাম এ লোক পুরুষ নয়, মেয়ে মানুষ। তখন তার প্রতি আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো। আমি তার পিছু নিলাম।'

'হ্যাঁ! বন্ধু তুমি ঠিকই দেখেছো।' আল আস বললো, 'ও পুরুষ নয়, একজন নারী এবং খুবই সুন্দরী ও যুবতী। এই মেয়ে একজন বদকার ও পাপীষ্ঠ মেয়ে ছিল। সে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরী করে আসছিল।'

'সে খৃস্টান মেয়ে?'

'হ্যাঁ, খৃস্টান ছিল।' আল আস উত্তরে বললো, 'এখন সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি তাকে একজন মুসলমানের বাড়ীতে আশ্রয়ে রেখেছি। তাকে তুমি মহিলা দরবেশ বলতে পারো। সে দরবেশদের মত কথা বলে আর এবাদত বন্দেগী করে। সে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত এবং প্রতি রাতেই সে জন্য মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে।'

'আর তোমরা তার কথা বিশ্বাস করে তাকে আশ্রয় দিয়েছো?' এহতেশাম বললো, 'তোমরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সৈনিক। তোমরা এমন নারীর ছলনা কি করে বুঝবে?'

'তাহলে তুমি আমার সাথে চলো।' আল আস বললো, 'তুমি নিজেই তাকে দেখো আর তার কথা শুনে মনের সন্দেহ দূর করো। আর যদি তোমার মনে হয় সে এখনো খারাপ মেয়ে রয়ে গেছে তবে সে কথা আমাকে বলো। এটা তোমার

অভিজ্ঞতার বিষয়, তুমিই ভাল বুঝবে। আমি স্বীকার করছি, আমি তাকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছি। চলো, তুমি আমার সাথে।'

এহতেশাম আল আসের সাথে চলে গেল। তারা গিয়ে উঠলো এক বুজুর্গ লোকের বাড়ীতে। এই বুজুর্গ লোকটি দীর্ঘদিন ধরেই বায়তুল মোকাদ্দাসে বাস করে আসছেন। আল আস ও এহতেশাম তার ঘরে গিয়ে বসলো।

এ লোক একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নামাজ পড়তে মসজিদে চলে গিয়েছিলেন, এখনো ফেরেননি।

এহতেশাম আল আসকে বললো, 'মেয়েটিকে দেখার আগে আমি তোমার কাছে জানতে চাই, এ মেয়েকে তুমি কোথায় পেয়েছো? এ সম্পর্কে তুমি যা জানো সব আমাকে খুলে বলো।'

'ঘটনাটি গত বছর গ্রীষ্মকালের।' আল আস এহতেশামকে বললো, 'আমি মিশর থেকে কিছু দূরে বর্ডারে কমান্ডোদের দলে ছিলাম। তখন বায়তুল মোকাদ্দাস জয় হয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনটা তো টিলা, জঙ্গল, পাহাড় ও মরুভূমিতেই কেটে গেছে। ওই অঞ্চলে আমাদের সে কাজের দায়িত্ব ছিল, যে কাজ এখনও কমান্ডোরা করে যাচ্ছে।

অবশেষে আমার ফিরে যাওয়ার আদেশ হলো। আমাকে একটি দলের কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সবাইকে নিয়ে ফিরে যেতে বলা হলো। আমার সঙ্গে ছিল ষোল জন কমান্ডো সৈন্য। আমরা রওনা হলাম এবং প্রত্যেকেই যার যার মত গল্প

করতে করতে পথ চলছিলাম।

আমরা একটি পাহাড় অতিক্রম করছিলাম। পাহাড়ের এক স্থানে একটি টিলা স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে ছিল। আশপাশের অন্যান্য টিলাগুলোও ছিল ভয়ংকর ধরনের। মনে হচ্ছিল আমরা এক অদ্ভুত এলাকায় প্রবেশ করেছি।

আমার এক কমান্ডো তামাশা করে বললো, 'মনে হচ্ছে আমরা জ্বীন ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছি। এমন জায়গায় হয়তো সুন্দরী পতিতাদের প্রেতাত্মারা বাস করে।' আমি তার কথা শুনে একটু হাসলাম এবং টিলার সেই গোলক ধাঁধাঁ পার হতে গেলাম।

টিলাটি দেখে আমার তেমন ভয় লাগেনি। কারণ আমি জীবনে এর চেয়েও ভয়ংকর জায়গায় রাত কাটিয়েছি। আমরা এমন জায়গায় রাত কাটিয়েছি যেখানে মানুষের কংকাল ও হাড়হাড্ডি চারদিকে ছড়ানো ছিল।

কিন্তু আমরা যখন টিলার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে প্রবেশ করলাম তখন রীতিমত আতংকিত হয়ে উঠলাম। আমি জীবনে প্রথমবারের মত অনুভব করলাম ভয় কি জিনিস। আমার সমস্ত সৈন্যরা কালেমা পড়তে লাগলো।

আমরা দেখলাম, সামনে এক টিলার ছায়ায় এক নারী বসে আছে। তার সামনে আরেক নারী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তারা উভয়েই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাদের গায়ের রং রৌদ্র তাপে ও ধূলোবালিতে ধুসর বা বাদামী রং ধারণ করেছিল।

দুটি মেয়েই যুবতী। তাদের ঠোঁট ধূলোবালিতে ও পিপাসায় শুকিয়ে ফেটে গিয়েছিল। তাদের মুখ খোলা ও মাথার চুল

ছড়িয়ে আছে। এমন ভয়ংকর অবস্থায়ও মনে হলো, মেয়ে দুটি অপূর্ব সুন্দরী।

এমনটা হতেই পারে না যে, এরা মানুষ। এটা কোন রাস্তাও নয় যে, কোন কাফেলা এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতের দল তাদের লুট করে এনেছে। নিশ্চয়ই এরা নিজেরাই পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোন মানুষ এমন কর্ম করবে না। তাহলে এরা কারা? ভূত? নাকি জ্বীন?

ভয়ে আমার সর্ব অঙ্গ কাটা দিয়ে উঠলো। আমি ভীত সৈন্যদের সাহস দিতে গিয়ে নিজেই এমন শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। আমাদের সবার পা তখন এক জায়গায় অনড় হয়ে আছে। কেউ আমরা পা নাড়াতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

তাদের দেখামাত্র যে কথাটা আমার প্রথম মনে হলো তা হচ্ছে, এরা মানুষ নয়, কোন পাপী ও পতিতা নারীদের প্রেতাত্মা। আমরা মনে মনে আশা করছিলাম, ওরা এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাক, যাতে আমাদের চলার রাস্তা ফাঁকা হয় এবং আমরা আবার চলা শুরু করতে পারি।

কিন্তু তারা যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল। বসা মেয়েটা আমাদের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। আমার এক সাথী ফিসফিস করে বললো, 'চলো পিছনে ফিরে যাই।' অন্য একজন সায় দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তাই চলো, কিন্তু ওদের পিছন করো না। তাহলে ওরা ছুটে এসে আমাদের ঘাড় মটকে দিতে পারে।'

ওদের থেকে আমরা মাত্র পনেরো বিশ গজ দূরে ছিলাম। আমরা এক পা দু পা করে ধীরে ধীরে পিছনে সরতে শুরু করেছি মাত্র, তখন বসা মেয়েটা মাথা দিয়ে ইশারা করে আমাদের কাছে ডাকলো। আমরা আর এক পা পিছনে রেখেছি, মেয়েটি আবারও ইশারা করলো। দেখলাম তার চোখে অশ্রু।

এ সময় আমি এক অবিশ্বাস্য শব্দ শুনে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। মেয়েটা স্পষ্ট উচ্চারণে বললো, 'পালিয়ে যেওনা আল আস। আমাদের দেখো। আমরাও মানুষ।'

সহসাই আমার হাত আমার কোমরে চলে গেলো। নিজের ইচ্ছায় নয়, যেন অলৌকিক শক্তি বলে কোষ থেকে আমি তলোয়ার বের করে ফেললাম।

তারপর আমার ভেতর এ শক্তি কোত্থেকে এলো আমি নিজেই জানিনা, দেখলাম আমার পদক্ষেপ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার সৈন্যরা চিৎকার করে বললো, 'সামনে যেও না আল আস। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

কিন্তু তখন আমার মধ্যে কোত্থেকে যেন সাহস ও শক্তি দুই-ই ফিরে এসেছে। আমি তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে চলেছি। আমি মেয়েটির কাছ থেকে তিন চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে গেলাম।

সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। ও খুব দুর্বলভাবে আমার দিকে আসতে লাগলো। আমি দেখলাম মেয়েটির পা টলছে। সে টলতে টলতে আরেক পা সামনে বাড়ালো। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল আর সে এমনভাবে আমার সামনে পড়ে গেলো যে,

তার মাথা আমার পায়ের কাছে এসে পড়লো। তার মাথার চুলগুলো আমার পা ঢেকে দিল।

আমি বিবস্ত্র এক নারীর গায়ে হাত দিতে ইতস্তত করছিলাম। সে যদি বিবস্ত্র নাও হতো তবুও আমি ভয় পেতাম। কিন্তু আমাকে তো দেখতে হবে, এ সত্যি মানুষ, নাকি প্রেতাত্মা।

আমি ওখানে হাটু গেড়ে বসে পড়লাম। হাত দিয়ে তার হাতের নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করলাম। মানুষের নাড়ীর মতই তারও নাড়ীর স্পন্দন চলছে, তবে খুবই দুর্বলভাবে।

আমার ধারণা ছিল, প্রেতাত্মা ও জ্বীনদের স্পন্দন থাকে না। আমি জলদি অন্য মেয়ের কাছে গেলাম। তার শরীর বরফের মত ঠান্ডা। যদিও তখন মাথার ওপর কড়া সূর্য জ্বলছিল, আর সেই উত্তাপে আমরা ঘামছিলাম।

দেখলাম সেই মেয়ের নাড়ীতে কোন স্পন্দন নেই। অর্থাৎ তার দেহে আর প্রাণ নেই। তার মুখ খোলা ও চোখ এক দিকে স্থির হয়ে আছে। তার শরীরে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট।

আর যে আমার সামনে পড়েছিল তার শরীর ছিল গরম। এরা জ্বীন ও প্রেতাত্মা নয়। আল্লাহ আমাকে বোধশক্তি ও সাহস দিলেন। আমি আমার সঙ্গীদের ডাকলাম। আমাদের সাথে পানির মশক ও খাবার ছিল। আমি বললাম, 'জলদি পানি ও দুটি চাদর আনো।'

সাথীরা চাদর ও পানি আনল। তখনও সূর্য মাথার উপর আসেনি। টিলার ছায়াঘেরা জায়গায় ওদের সরিয়ে আনলাম আমরা। একটি চাদর নিচে বিছিয়ে দিয়ে সেখানে শুইয়ে দিলাম

ওদের। অন্য চাদর দিয়ে উভয় নারীর বিবস্ত্র শরীর ঢেকে দিলাম।

বেঁচে থাকা মেয়েটির খোলা মুখে অল্প অল্প করে পানির ফোটা দিতে থাকলাম। পানি শিঘ্রই তার গলার মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করলো।

আমার সঙ্গীরা আমাকে বাঁধা দিতে লাগলো। বললো, 'আপনি নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। এরা মানুষ নয়, চলুন পালিয়ে যাই। কিন্তু তখন আমার মনে কোন বিপদের আশংকা ছিল না। আমি সাথীদের বাঁধা অগ্রাহ্য করে মেয়েটির শশ্রুষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটির চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে তার হা করা মুখাট বন্ধ করে নিল। ইশারায় সে আবার পানি চাইল। আমি তার মুখে আরও পানি ঢেলে দিলাম। পরে একটি খেজুরের প্যাকেট খুলে তার হাতে খেজুর দিলাম। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো। আমি তাকে ধরে বসিয়ে দিলে সে বসে খেজুর খেতে লাগলো।'

আর্ল আস এহতেশামকে ঘটনা শুনাচ্ছিল। 'খেজুর খেয়ে সে আবারও পানি পান করলো। সে ছিল খুবই ক্ষুধার্ত। খেজুরের পোটলাটার দিকে সে করুণ চোখে তাকালো।

আমি তাকে আমাদের যে খাবার ছিল তা খেতে দিলাম। সে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলে আমি তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম, 'আস্তে ধীরে খাও। একবারে বেশী খাওয়া ঠিক নয়, কম করে খাও।'

তার পেট কত দিন ধরে খালি আল্লাহ মালুম। সে খেতেই থাকলো। আমি তার সামনে থেকে খাবার সরিয়ে নিলাম। সে দুর্বল কণ্ঠে বললো, 'আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি। তুমি শুধু আমাকেই খাওয়াচ্ছো, ওকে দিচ্ছো না কেন? ও কি মরে গেছে?'

আমি বললাম, 'ওর আর কোনদিন খাওয়ার দরকার পড়বে না।'

সে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কে?'

আমি বললাম, 'আমরা সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো সেনা।'

তার মধ্যে কেমন একটা ভীতি ভাব লক্ষ্য করলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছো?'

'আমরা সবাই বায়তুল মোকাদ্দাস যাচ্ছি।'

মেয়েটির চোখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল। দুর্বল কণ্ঠে সে বললো, 'তবে তো আমার আর বাঁচার কোন আশাই রইলো না।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তুমি মুসলমান নও। কিন্তু....'

সে আমার কথা শেষ হতে দিল না। বললো, 'আমি মিথ্যা বলবো না। এখন আর সত্য-মিথ্যায় আমার কিছু আসে যায় না। তাই আমি যা বলবো, সত্য কথাই বলবো। আমার কথা শুনে ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো, তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো মরেই গেছিলাম।'

আমি তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম, 'তুমি আমাদের শুধু বিশ্বাস

করাও, তুমি জ্বীন পরী কিছু নও, তুমি মানুষ।'

তার মুখে তখন এক টুকরো ফিকে হাসি ফুটে উঠলো। ধীরে ধীরে তার চেহারার রংও কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল। কারণ পেটে কিছু দানাপানি পড়ায় তার শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছিল। কিন্তু ক্লান্তিতে তার চোখে ঘুম চেপে আসলো।

ঘুমে সে এতটাই কাতর হয়ে গেল যে, সে কিছু বলতে গিয়েও আর বলতে পারলো না। সে শিশুর মত ঘুমে ঢলে পড়লো ও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

জীবনে আমাদেরকে বহু মানুষ খুন ও হত্যা করতে হয়েছে। কমান্ডো আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা চোখের সামনে আমাদের অনেক সাথীকে শহীদ হতে দেখেছি। মানুষের মৃত্যু আমাদের কাছে কোন নতুন বিষয় ছিল না। কিন্তু আমরা কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে মারিনি বা মারতে যাইনি।

ও একটি মেয়ে। এই মেয়ে যদি আমাদের শত্রুও হয় তবু তার উপর হাত উঠানো অন্যায়। একটি অসহায় মেয়েকে নির্যাতন করার শিক্ষা আমরা পাইনি, বরং এ ধরনের কাজকে আমরা আমাদের জন্য কবিরা গুনাহ মনে করি!

আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, 'সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। টিলার দিকে তাকাও। একটু পরই এখানকার ছায়া সরে যাবে। সামান্য বিশ্রাম করে নাও। এ যখন জাগবে তখন আমরা তাকে সাথে নিয়ে রওনা দেবো।'

আমার এক সাথী বললো, 'হয়তো এরা খৃস্টান গোয়েন্দা। আমাদের আসার খবর পেয়ে এখানে ফাঁদ পেতেছে।'

অন্য এক সাথী বললো, 'এমন ভয়ংকর জায়গায় মেয়ে গোয়েন্দাদের কি কাজ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এরা মানুষ না। এরা ডাইনী বা প্রেতাত্মা। আমাদের উচিত ওর এই ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে এখান থেকে দ্রুত সরে পড়া।'

'আমার ধারণা, আমাদের কমান্ডোরা মিশর ও ফিলিস্তিনের সীমান্তে যে তৎপরতা চালাচ্ছে, তাতে শঙ্কিত হয়ে খৃস্টানরা ষড়যন্ত্রের জাল পাতছে। এই মেয়ে দুটি তার অংশ। আমাদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার জন্য তাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ক্রুসেড গোয়েন্দারা।' বললো আরেকজন।

কিন্তু এসব কথা আমার বিশ্বাস হলো না, তাহলে তাদের সাথে দু'চার জন পুরুষ থাকতো।

সূর্য অস্ত যাওয়ার একটু আগে সে জেগে উঠলো। আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। সে পানি চাইলো। আমি তার হাতে পানি তুলে দিলাম। সে পানি পান করে কিছু খাবার চাইলো। আমি আমাদের খাবার থেকে তাকে কিছু খাবারও দিলাম। খাওয়ার পর সে সুস্থির হয়ে কথা বলতে লাগলো।

তার কণ্ঠ তখনো দুর্বল থাকলেও চিন্তাশক্তি সতেজ হয়ে উঠলো। সে পাশের মেয়েটির দিকে ইশারা করে বললো, 'একে দাফন করে দাও।'

আমার সিপাইরা দ্বীনদার মানুষ ছিল। একজন তার চাদর দান করলো। সঙ্গীরা কবর খোদাই করলো এবং লাশটিকে সেই চাদরে ঢেকে দাফন করে দিল।'

আল আস এহতেশামকে বললো, 'মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞেস

করলাম, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছো? কোথায় যাবে? তোমাদের এই অবস্থা কেন?'
মেয়েটি চুপ করে রইলো, কোন জবাব দিল না। সে বরং উল্টো আমাকে প্রশ্ন করলো, 'তুমি তোমার খোদাকে দেখেছো?'
'হ্যাঁ, দেখেছি। আমি আমার খোদাকে দেখেছি তার সৃষ্টির মধ্যে, তার অফুরন্ত রহমতের ধারায়।'
সে বললো, 'আমিও তোমার খোদাকে দেখেছি। আমি এই মাত্র তাকে দেখলাম, তার কথা শুনলাম। হয়তো তুমি বলবে এটা আমার স্বপ্ন। কিন্তু না, এটা স্বপ্ন নয়, এটাই বাস্তব। খোদা আমাকে বলেছেন, 'আমি তোমাকে এমন চোখ দিয়েছি, যে চোখ দিয়ে তুমি অন্ধকারেও সব দেখতে পাবে। এমনকি আগামী সময়টাও দেখতে পাবে।'
খোদা আমাকে আরো বলেছেন, 'তুই যদি আবার তোর পাপের কথা স্মরণ করিস বা চিন্তা করিস তবে তোর খঞ্জর তোর চোখ অন্ধ করে দেবে।' খোদা আমাকে একথাও বলেছেন, 'আমি তোকে এমন স্থানে পাঠিয়ে দেবো যেখান থেকে আমি আমার রাসুল (সা.)কে ডেকে নিয়েছিলাম।'
সে এমন ধরনের অনেক কথাই বললো। তার কথায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, মরুভূমির কঠিন যাত্রা এবং প্রচন্ড বিপদ তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এখন সে নিরেট এক উন্মাদিনী।
সে আমাকে বললো, 'তুমি আমার শরীর কেন ঢেকে দিলে? যেভাবে ছিল সেভাবে থাকলে কি ক্ষতি হতো? আমার তো

এখন শরীরের কোন অনুভূতি নেই। আমি এখন শুধু আত্মাসর্বস্ব প্রাণী! আত্মা যদি পবিত্র হয়ে যায় তবে দেহে ময়লা লাগবে কেমন করে?'

সে সব সময় এমন কথাই বলে। তাতে আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে, সে মানুষ, ভূত প্রেত কিছু নয়। সে আমাকে জানানোর আগেই আমার জানা হয়ে গেছে, সে খৃস্টান মেয়ে। ওরা আমাদের আমীর, মন্ত্রীবর্গ ও সেনাপতিদের গাদ্দার বানানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। ওরা গোপন তথ্য গ্রহণ করে খৃস্টানদের কাছে সরবরাহ করতো। ওদের রূপের মোহ ও প্রেমের ছলাকলায় পড়ে গাদ্দারেরা দেশ বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না।

তার কথা যত আধ্যাত্মিকতামন্ডিতই হোক না কেন, আমার সন্দেহ হলো, হয়তো তার এসব কথার সবটাই ভান, নিছক অভিনয়। আসলে তার কিছু হয়নি, সে এসব কথা বলে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে, যাতে আমি তাকে পাগলী মনে করে তার পছন্দমত স্থানে পৌঁছে দেই।

আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে সত্যি করে বলো, তোমরা দু'জন আসলে কোথায় যাচ্ছিলে?'

সে এবারও কোন জবাব দিল না। আমি তাকে ধমক দিলাম, চাপ প্রয়োগ করলাম। কিন্তু সে অর্থহীন প্রলাপ বকে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল। আমি আমার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা বললো, 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন আমাদের রওনা করা উচিত।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে নাও। হয়তো মাথা ঠিক হলে তার' পরিচয় আমরা জানতে পারবো।'

আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে বোকা ও হাবা গোছের লোক ভাবছো। তাই আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছো। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এখানেই থাকো, আমরা যাই।'

সে বললো, 'আমি অবশ্যই আমার পরিচয় তোমাকে বলবো। তবে এখন নয়, সময় হলেই তুমি জানতে পারবে আমি কে? আপাতত তুমি আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।'

সূর্য ডোবার পর আমি তাকে আসবাবপত্র বহনকারী ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিলাম। তারপর আমরা আবার রওনা হয়ে গেলাম বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা পথ চললাম। কারণ রাতে রোদ থাকে না বলে রাতেই পথ চলতে আরাম। সে জন্য আমরা সারা রাত পথ চলতাম এবং দিনে বেশীরভাগ সময়ই বিশ্রাম নিতাম।

আমি আমার সৈন্যদের বললাম, 'আমি যদি মেয়েটিকে নির্জনে নিয়ে যাই তাহলে কি তোমরা কিছু মনে করবে? আমরা কমান্ডো সেনা, অপরিচিত একটি মেয়েকে সঙ্গে রাখা যেমন বিপদজনক তেমনি অসহায় একটি মেয়েকে এই নির্জন পাহাড়ী পথে ছেড়ে যাওয়াও মানবতা পরিপন্থী। এমনটি কিছুতেই আমাদের বিবেক সায় দেবে না। তাই আমি মেয়েটির পরিচয় ও তার উদ্দেশ্য জানতে চাই।'

আমার সঙ্গীরাও আমার সাথে একমত হলো, এ মেয়ের উদ্দেশ্য আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। এবং তারা এ

কাজের দায়িত্ব আমাকেই দিল।

আমার সৈন্যরা আগে আগে চলতে লাগলো। আমি আমার মালবাহী ঘোড়ার সাথে তাদের পিছনে চলতে লাগলাম। কিন্তু মেয়েটি তখনো আগের মতই সতর্ক। সে আগের মতোই এলোমেলো কথাবার্তা বলতে লাগলো।

অর্ধেক রাত পার হয়ে গেল। আমরা একস্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। আমি তাকে সবার থেকে দূরে এক তাবুতে রাখলাম। শুধু আমার তাবুটিই তার কাছে থাকলো।

রাতে আমি তাকে আর একবার জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন কোথায় যেতে চায়।

সে বললো, 'তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাও আমি সেখানেই যাবো।'

আমি বললাম, 'আমি তোমাকে জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

সে বললো, 'অসুবিধা কি? জেলখানাতেও তো আল্লাহ আছেন।'

বুঝলাম, সে এভাবে ধরা দেবে না। তার ইচ্ছে জানতে হলে আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে।

আমি তাই করলাম। আমি তার সাথে প্রেম করতে চাইলাম। আসলে আমি চাচ্ছিলাম, ও আমার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলুক। আমাকে বিশ্বাস করুক। কিন্তু এতেও কোন কাজ হলো না। সে আমার ফাঁদে ধরা দিল না।

আমি ভাবলাম, সে যেহেতু খৃস্টান মেয়ে তাই সে আমার সাথে দরকষাকষি করবে। আমাকে বলবে, 'আমাকে অমুক খৃস্টান

এলাকায় বা শহরে রেখে এসো। বিনিময়ে তুমি যা চাও তাই পাবে।'

কিন্তু তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে আমার কোন কথাই গ্রাহ্য ও কর্ণপাত করলো না। শেষে আমি আমার তাবুতে ঘুমোতে চলে গেলাম।

পরের দিন রাত। আগের রাতের মতই আমাদের তাবু দুটি পাশাপাশি। তার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা বাদ দিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে আমি অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছে ওকে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দেবো। ওরা বুঝবে, এ মেয়ের কাছ থেকে কিভাবে কথা বের করতে হবে।

পাহারাদার ছাড়া দলের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমিও আমার তাবুতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনো ঘুম আসেনি আমার। এমন সময় সে এলো আমার তাবুতে। গত দু'দিন চেষ্টা করেও আমি যা পারিনি আজ বিনা চেষ্টাতেই তা পেয়ে গেলাম। সে তার পরিচয় আমার কাছে খুলে বললো। সেই প্রথম আমি জানতে পারলাম, সে কে এবং কোত্থেকে এসেছে।

সে বললো, 'আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না বলে এই দু'দিন তোমার কোন প্রশ্নের জবাব দেইনি। আমার ভয় হচ্ছিল, পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এই ভয়ে আমি মুখ বন্ধ করে ছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, মুখ বন্ধ রেখেও তো আমি বাঁচতে পারবো না। শেষ পর্যন্ত আমি মুখ না খুললে শুধু এই অপরাধেই তো তোমরা

আমাকে হত্যা করতে পারো। তখন আমি মত পাল্টালাম। এখন তুমি বলো, তুমি কি আমার পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেলবে? তাহলে আরো দু'দিন বাঁচার আশায় আমি না হয় মুখ বন্ধ করেই থাকবো।'

আমি তাকে বললাম, 'লড়াইয়ের সময় প্রতিপক্ষকে আমরা সহজেই হত্যা করতে পারি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে হত্যা করার অনুমতি আমাদের নেই। তুমি যত বড় অপরাধীই হওনা কেন, বিচার না করে কোন শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার আমাদের কারো নেই।

আর আমরা কমান্ডো বাহিনী, কারো বিচার করার অধিকারও আমাদের নেই। আমরা বড়জোর তোমাকে আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে তুলে দিতে পারি। তারা তদন্ত করে দেখবে তোমার দেয়া ভাষ্য ঠিক আছে কিনা।

তারপর তারা তোমাকে আদালতে সোপর্দ করবে। আদালতই নির্ধারণ করবে তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত। অতএব তুমি নির্দ্বিধায় তোমার পরিচয় বলতে পারো। এতে তোমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।'

সে বললো, 'তাহলে শোন। গত পাঁচটি বছর আমি কাটিয়েছি কায়রোতে। সেখানে এক রাজকুমারী বা শাহজাদীর মতই ছিল আমার জীবন। ওখানে আমি এক আমীরের আশ্রিতা ছিলাম। কিন্তু আমি ছিলাম আসলে এক খৃস্টান গোয়েন্দা। প্রচুর ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণের পর আমাকে কায়রো পাঠানো হয়েছিল।

সেখানে আমি প্রথমেই দু'জন আমীরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি

করে দিলাম। পরে আরও একজনকে তাদের শত্রু বানিয়ে ছিলাম। কায়দা করে আমি তিনজনকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগিয়ে দিলাম।

এরপর আমি কয়েকজন সরকারী অফিসারকে হাত করলাম। তাদের দিয়ে কায়রোর সরকারী কাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলাম।

এরপর আমাকে দু'জন খৃস্টান গোয়েন্দার নাম দিয়ে বলা হলো, 'এরা ধরা পড়ে কায়রোর কারাগারে বন্দী আছে। তুমি এ দু'জনকে উদ্ধারের চেষ্টা করো।'

আমাকে খুব বেশী চেষ্টা করতে হয়নি। খৃষ্টান গোয়েন্দা দু'জনকে মুক্ত করার পর আমি জানতে পারলাম তাদের দু'জনেরই বিচার সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। দু'এক দিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হতো।

আমি যেই আমীরের রক্ষিতা সেই আমীরের সহায়তায় তাদেরকে কায়রো থেকে পালানোর সুযোগ করে দিলাম। তারা চলে যাওয়ার পর সেখানে নতুন দায়িত্ব নিয়ে আরো দু'জন গোয়েন্দা এলো। তারা আমার সাহায্য চেয়ে বললো, 'আমরা সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি।'

কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তাদের কাছে হাত্তিন যুদ্ধের ফলাফল এসে পৌঁছলো। তারা এটাও জানতে পারলো, খৃস্টানদের পবিত্র ক্রুশ চিহ্নটি এখন সুলতান আইয়ুবীর কাছে। আর সে ক্রুশের রক্ষক তাদের মহান পাদ্রী হাত্তিনের ময়দানে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

তারা আরো খবর পেলো, এই যুদ্ধে কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট মারা গেছেন অন্য সম্রাটরা সবাই বন্দী হয়েছেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসক গে. অব লুজিয়ানও আছেন এই বন্দীদের তালিকায়।

এ সব সংবাদ তাদের কাছে বজ্রাঘাতের মতই মনে হতে লাগলো। অবশেষে তাদের কাছে আরও দুটি সংবাদ পৌছলো। তারা জানতে পারলো, তাদের উস্তাদ হরমুনও বন্দী হয়েছেন এবং ঈশ্বরের পুত্র মহান যিশুর স্মৃতিবিজড়িত জেরুজালেম খৃস্টানদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে চলে গেছে এ খবর শুনে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল।

তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়রোতে পাঠানো হয়েছিল কায়রোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য। এ ধরনের শয়তানী কাজের সব শিক্ষাই তারা ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছিল।

তাদেরকে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির পরিবর্তে ধোঁকা ও ছলনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। নীতি নয়, দুর্নীতিতেই তারা ছিল দক্ষ ও পারঙ্গম। ধর্মীয় আচার পালনের ব্যাপারে তারা ছিল স্বাধীন। কারণ গোয়েন্দাদের ধর্মীয় পরিচয় তাদের উপকারের চাইতে অপকার করে বেশী। এ জন্য ধর্মীয় বিধান পালনের কোন নির্দেশ তাদের ওপর ছিল না।

তাদেরকে শুধু বলা হয়েছিল, 'ঈশ্বরের পুত্র ঈসা মসীহের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তৈরী করা হয়েছে এক বিশাল ক্রুশ। এই ক্রুশ

খৃষ্টানদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। যতোদিন এই ক্রুশ আমাদের হাতে থাকবে ততোদিন আমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো, এই ক্রুশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ঈশ্বর পুত্রের ভক্তদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়তে হবে।'

তাদের প্রশিক্ষণের পর সেই বিশাল ক্রুশের আশির্বাদ নেয়ার জন্য তাদেরকে আক্রায় পাঠানো হয়। সেখানকার বড় গির্জার মহান পাদ্রী ক্রুশ স্পর্শ করে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

শপথ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'ক্রুশের শাসন শ্রেষ্ঠ শাসন। তার কেন্দ্র জেরুজালেম, যেখানে হযরত ঈসা মসীহকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলাম কোন ধর্ম নয়। মুসলমানদের খৃষ্টান ধর্মে নিয়ে আসা এবং যারা আসবে না তাদের হত্যা করা অসীম পূণ্যের কাজ। যে সব মেয়েরা ক্রুশের জন্য তাদের সম্ভ্রম কোরবাণী দেবে তাদেরকে পরকালে জান্নাতের হুর বানানো হবে।'

তিনি এইসব গোয়েন্দাদের এ রকম আরো অনেক নসীহত করলেন। তারাও পাদ্রীর সব কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সেই ক্রুশ স্পর্শ করে তার সম্মান রক্ষার শপথ করলো।

এ জন্য তারা শাসকদের হুকুমে যে কোন পাপ কাজ করাকে খুবই পূণ্যময় কাজ বলে গণ্য করতো। আর এসব পূণ্য কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল মুসলমানদের ধোঁকা ও প্রতারণা করা। তারা যখন জানতে পারলো, পবিত্র ক্রুশও নেই, ক্রুশের রক্ষকও নেই, আর ঈসা মসীহের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম, যা

ক্রুসেড শাসনের মুলকেন্দ্র তাও খৃস্টানদের দখলে নেই, তখন তাদের এতদিনের সব বিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

তারা আরও লক্ষ্য করলো, কায়রোতে যে সব পুরুষ গোয়েন্দা তাদের সাথী ছিল, তারা সবাই পালিয়ে গেছে।

একদিন এক গোয়েন্দা তার সাথীর খোঁজে বের হয়ে শুনতে পেলো, সেও নিখোঁজ। কায়রোতে যারা আমাদের সহযোগী ছিল তাদের একজন তাকে বললো, 'এখন এখানে তোমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। তুমি কোন মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে মুসলমান হয়ে যাও নইলে এখান থেকে পালাও।'

তখন সেই গোয়েন্দা পাগলের মত হয়ে গেল। সে আমার সাথে দেখা করে সব খুলে বললো আমাকে। সেই সাথে বললো তার পরিকল্পনার কথা। বললো, 'পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের।'

আমিও তার সাথে একমত হলাম। সে আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হলো। তখন আমি তাকে আমার বান্ধবীর কথা বললাম। সে তাকেও সঙ্গে নিতে সম্মত হলো।

এই আলাপের পর সে আমাদের এক সহযোগী মুসলমান অফিসারের কাছ থেকে তিনটি ঘোড়া চেয়ে নিল। বললো, 'আমার এই দু'বোনের ভ্রমণের শখ হয়েছে। তুমি তিনটি ঘোড়া দাও, আমরা একটু ভ্রমণ করি।'

সেই অফিসার সরল বিশ্বাসে তার হাতে তিনটি ঘোড়া তুলে দিল। আমরা দু'বান্ধবী সন্ধ্যার একটু আগে বাসা থেকে বের হলাম। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। আমরা সেই গোয়েন্দার

বলে দেয়া জায়গায় গিয়ে তার সাথে দেখা করলাম।

আমরা তিনজন তিনটি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। সন্ধ্যা যখন গভীর হলো তখন আমরা শহর থেকে অনেক দূরে।

আমরা সঙ্গে করে কিছু খাবার ও পানি নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু মরুভূমির সফর সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আমাদের গন্তব্যস্থান সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না আমাদের। আমাদের মাথায় তখন একটাই চিন্তা, আগে কায়রোর সীমানা অতিক্রম করতে হবে।

আমাদের আশা ছিল, পথে হয়তো কোন খৃস্টান বাহিনীর সন্ধান পেয়ে যাবো। কিন্তু আমাদের বড় দুর্ভাগ্য ও বোকামী হলো, আমরা রাস্তার কোন খোঁজ খবর না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

সারা রাত পথ চললাম আমরা। ঘোড়া খুব জোরে না ছুটালেও কোথাও থামলাম না। রাত কেটে গেল। প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা কায়রো থেকে অনেক দূরে চলে এলাম।

পরদিন। ভোর হতেই মাথার উপর সূর্য তাপ ছড়াতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে মরুভূমি তপ্ত আগুনের কড়াই হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো পিপাসা ও ক্লান্তিতে দুর্বল ও মরণাপন্ন হয়ে উঠলো। আমাদের অবস্থাও তখন সংকটাপন্ন।

সামনেই আমরা মরুভূমিতে পানি ও সবুজ মাঠ দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে পৌঁছে দেখলাম, কোথায় পানি, কোথায় ঘাস? সবই বালি আর বালি। আমরা বালির এক অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

যেদিকেই আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাই সেদিকেই বালি। এই বালির সমুদ্রে আমরা উদভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

সে দিনটির কষ্টের কথা মনে পড়লে এখনো আমার গা কাটা দিয়ে উঠে। তারপরও সেদিনটি কোন মতে পার হয়ে গেল। মরণাপন্ন হওয়ার পরও কেউ আমরা মারা গেলাম না। না ঘোড়া, না আমরা।

রাত নেমে এলো। কমে এলো তপ্ত লু হাওয়ার ঝাপটা। বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেল। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে সাথের শেষ পানিটুকু পান করে শুয়ে পড়লাম।

আমরা এতই ক্লান্ত ছিলাম যে, সারা রাত আমরা আর চেতনা পেলাম না। ভোরে যখন সূর্যের উত্তাপ আমাদের গায়ে লাগলো তখন আমরা ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

রাতে আমরা সামান্য পানি পান করলেও ঘোড়া দু'টিকে কিছুই দিতে পারিনি। তারপরও আমরা আমাদের ঘোড়ায় চেপে বসলাম। ঘোড়া আবার রওনা হলো একদিকে। পানি ও আহারের অভাবে দুপুরের আগেই আমার ঘোড়াটি মারা গেল। আমি আমার বান্ধবীর ঘোড়ায় উঠে বসলাম।

তখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে একজন পুরুষ সঙ্গী ছিল। আমরা আবার রওনা হলে ক্লান্ত ঘোড়া আমাদের দুই বান্ধবীর ভার সইতে না পেরে খুবই ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। পুরুষ গোয়েন্দার ঘোড়াটি আমাদের ছাড়িয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর এক সময় তাকিয়ে দেখি তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

তখন আমাদের নজরে আসে এই টিলাগুলো। আমরা টিলার দিকে এগুচ্ছি, এই সময় বান্ধবীর ঘোড়াটিও মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠতে পারলো না।

টিলা ওখান থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। আমরা দু'জন টিলার দিকে হাঁটতে লাগলাম। কখন টিলার আড়ালে পৌঁছেছি মনে নেই আমার। তারপরের অবস্থা তো তুমিই ভাল জানো।'

এহতেশাম! তুমি তো ভাল করেই জানো নিষ্ঠুর মরুভূমি এমন অসহায় যাত্রীদের কেমন পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছায়। মেয়েটা নিজেই আমাকে বলেছে, 'আমি যেমন মানুষদের ধোঁকা ও ছলনা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছি তার চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর ধোঁকা ও ছলনা পেয়েছি আমি মরুভূমির কাছ থেকে।

আমি মরুভূমিতে নদীর স্রোত দেখেছি। সেই স্রোত দেখে যতই নদীর দিকে ছুটে গেছি ততোই নদী সরে গেছে দূরে। আমরা দু'জন ছুটতে ছুটতে খেজুর বাগান দেখতাম, ফুলের বাগান দেখতাম, পাল তোলা নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ দেখতাম। আমরা হাত নেড়ে চিৎকার করতাম একটু সাহায্যের আশায়। প্রাণপণে দৌড়ে যেতাম ওদের দিকে। যতই ছুটতাম ততোই ওরা সরে যেতো দূরে। কিভাবে যে সে সময়গুলো কেটেছে তা কাউকে বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়।'

মেয়েটি আমাকে বললো, 'মরুভূমিতে সেই দুঃসহ জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়েই বোধোদয় ঘটলো আমার। যে ক্রুশের জন্য সতীত্ব বিসর্জন দিলাম, জীবন দিতে গেলাম, মনে হলো তার সবই ছিল ভুল।

খোদার পুত্র বলে কেউ ছিল না, থাকলে আল্লাহ তার পুত্রের খাদেমদের অবশ্যই সাহায্য করতেন। ক্রুশ মিথ্যা, বাইবেল মিথ্যা, মিথ্যা পাদ্রীদের বাণী। খৃস্টান ধর্মের মধ্যে যা আছে তার সবটাই মিথ্যা। নইলে কোন ধর্ম কি অন্য মানুষের অনিষ্ট করার জন্য শিক্ষা দিতে পারে তার সন্তানদের? আমার মনে হলো, এতকাল আমি এক মহা মিথ্যার মধ্যে বসবাস করেছি।

মরুভূমির সেই গোলকধাঁধাঁয় পড়ে আমার এতদিনের অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটলো। মৃত্যু ঘটলো খৃস্টানদের বহু প্রশংসিত সার্থক এক অনুপম গোয়েন্দার। যে অস্তিত্ব নিয়ে আমি কায়রো ছিলাম, যে অস্তিত্বের বলে গোলাম বানাতাম মুসলমান আমীর ও শাসকদের, সেই নারী হারিয়ে গেল সেই গোলকধাঁধায় পড়ে। আমার অন্তর তখন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো অনুশোচনায়, যাতনায়। অতীতের স্মৃতি যতই মনে হতে লাগলো ততোই কাটার মত বিঁধতে লাগলো একেকটি ঘটনা।

হায়! মহান ক্রুশের রক্ষকরা এতো খারাপ! তারা তাদের নিজের সন্তানদের প্রতারণা শিক্ষা দেয়! ফুলের মত মেয়েদের নষ্টামী শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় অন্য মানুষের ক্ষতি করতে! হিংসা, ঘৃণা, লোভ, শঠতা, ষড়যন্ত্র, পাপাচার এসব কি কখনো ধর্মের অঙ্গ হতে পারে? তাহলে কিসের মোহে এতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম আমি?

জীবনের সুবর্ণ সময়গুলো আমি ব্যয় করে দিলাম মানুষের অনিষ্ট করে, ক্ষতি করে! এ পাপ সইবে কেন আল্লাহ! তাইতো আল্লাহ এই ভয়ংকর মরুভূমিতে এনে ফেলেছেন আমাকে

সেই পাপের শাস্তি দিতে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য তো আমাকেই করতে হবে।

আমি তখন বুঝতে পারলাম, যৌন সম্ভোগের লোভ দেখিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়া মোটেই পূণ্যের কাজ হতে পারে না। এ জন্যই মুসলমানরা তাদের কন্যা ও যুবতী মেয়েদের এভাবে ব্যবহার করে না। তারা জানে, খৃস্টানরা তাদের মেয়েদের লেলিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করছে মুসলমানদের। কিন্তু প্রতিশোধ হিসাবেও তারা কোন মেয়েকে এ কাজে নিয়োজিত করেনি। এর মানে হচ্ছে, মন্দের জবাব তারা মন্দ দিয়ে দিতে চায় না।

যে ধর্ম তার অনুসারীদের প্রতিহিংসার অনুমতি দেয় না সেটাই তো আসল ধর্ম! ঘৃণা দিয়ে আমরা সংঘাত সৃষ্টি করে সভ্যতার যে সংকট তৈরী করেছি ওরাও যদি আমাদের মতো ঘৃণারই চাষ করতো তবে পৃথিবীতে মানবতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? তাহলে ইসলামই কি সেই ধর্ম যা মানবতার রক্ষক, সভ্যতার রক্ষক?

তারপর এলো সেই হৃদয়বিদারক দুঃসময়। আমার বান্ধবী মরুভূমির প্রতারণা সইতে পারলো না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মৃত্যুর বিভীষিকা। পিপাসার যাতনা, ক্ষুধার যাতনা সবকিছু ম্লান হয়ে গেল এই মৃত্যুভীতির কাছে।

দুর্বলতা গ্রাস করে ফেলেছিল আমাকেও। কখন চেতনা হারিয়েছি, কখন আমার দুঃসময়ের সঙ্গী প্রাণের বান্ধবীটি মারা গেছে কিছুই জানতে পারিনি আমি।

তোমরা আমার মুখে পানির ফোটা দিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে

ফিরিয়ে এনেছো আমাকে। হয়তো আরেকটু আগে এলে তাকেও বাঁচাতে পারতে। তার মৃত্যু আমার কাছে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হয়ে রইলো। এখনো ভাবতে পারছি না, সে মারা গেছে।

আমরা তো একই বয়সী ছিলাম, এক সঙ্গে কায়রো এসেছিলাম, এক সাথেই সব অপকর্ম করেছি, এক সাথে মরুভূমিতে প্রবেশ করেছিলাম।

কোন দুশমন আমাদের তাড়া করেনি, কারো তীর লাগেনি গায়ে, কেউ তুলে দেয়নি তার হাতে বিষের পেয়ালা। আমরা এক সাথেই সেই টিলার রাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম, এক সাথে পাশাপাশি শুয়েছিলাম। অথচ এখন আমি তোমার সাথে কথা বলছি, কিন্তু সে নেই। কি অদ্ভুত কথা!'

আল আস বললো, 'মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আল আস! বলো তো ও এখন কি করছে? তাকে কি জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে? নাকি সে এখন প্রেতাত্মা হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে?'

আল আস বললো, 'আমি এ কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। হয়তো সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল তার বান্ধবীকে।

সে দেখছিল, একদল দোজখের ফেরেশতা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দোজখের দিকে। মেয়েটি কিছুতেই দোজখে যাবে না। সে দোজখের ফেরেশতাদের পা ধরে কান্নাকাটি করছে। কিন্তু তাতে মন গলছে না ফেরেশতাদের।

তারা তাকে ডান্ডা দিয়ে পিটাচ্ছে আর বলছে, 'যাবি না কেন? ওটাই তো তোর ঠিকানা। দুনিয়ায় তো তোর সব কাজই ছিল এ ঘরের জন্য। তুই যা কামিয়েছিস তাইতো আমরা দিচ্ছি তোকে। আমরা প্রত্যেকের পাওনা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য। তুই চাইলেও তা পাবি, নিতে না চাইলেও পাবি। এখানে বে-ইনসাফীর কোন সুযোগ নেই। নিজের জিনিস বুঝে না নিয়েও কোন উপায় নেই।

এক সময় মেয়েটি আবার মুখ তুলে বলতে শুরু করলো। সে বললো, 'অজ্ঞান অবস্থায় সেই টিলার রাজ্যে আমরা কয়দিন ছিলাম বলতে পারবো না। যখন আমার জ্ঞান ফিরলো তখন রাত।

আমি আমার অতীত কাজের জন্য অনুতপ্ত ছিলাম। জ্ঞান ফেরার পরও টের পেলাম, সেই অনুতাপেই দগ্ধ হচ্ছে আমার হৃদয়। আমার বান্ধবী তখনো অজ্ঞান বা ঘুমে ছিল। আমি তাকে ডাকলাম, কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না।

আমার মধ্যে সেই অনুতাপের আগুন তখনো দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আমি বান্ধবীকে ওখানে রেখে তার থেকে একটু দূরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়েই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকার পর মন কিছুটা সুস্থির হলো। আমি সিজদা থেকে মাথা তুলে আল্লাহর কাছে আমার অতীত পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলাম।

সারা রাত আমি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। এই সিজদা ও মোনাজাত ছাড়া মুসলমানদের আর কোন

ইবাদতের নিয়ম আমার জানা ছিল না। সেই রাতেই আমার বিবেকে ইশারা পেয়ে গেলাম, আমি আসল খোদাকে পেয়েছি।'

সে বললো, 'আমার সামনে ধোঁয়ার মত এক মেঘ এসে থামলো। তার মধ্যে এক বুজুর্গ লোককে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, 'যদি তুমি অন্তর থেকে তওবা করো তবে এ মরু নির্জনেও মানুষের সন্ধান পাবে। তুমি সেই সব লোকদের সাক্ষাৎ পাবে, যে খোদাকে তুমি ডেকেছো, তারা তাঁর প্রিয় ও অনুগত বান্দা। তখন তুমি এখান থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্ত হয়ে আবার লোকালয়ে ফিরে যেতে পারবে।'

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু তোমরা এমন উলঙ্গ অবস্থায় ছিলে কেন? এমন বেশরম হতে লজ্জা লাগলো না তোমাদের?'

'এ ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যময় হয়ে আছে। আমি একবার শুনেছিলাম, মরুভূমির দিকভ্রান্ত মুসাফিররা যখন সূর্য তাপে জ্বলতে থাকে তখন প্রথমে তারা সব আসবাবপত্র ফেলে দিতে থাকে। এরপর তারা সঙ্গের অস্ত্র ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরের সব কাপড় চোপরও খুলে ফেলে। তখন তার এমন অবস্থা হয় যে, নিজের শরীরে এক খন্ড কাপড়ও আর অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষ এ সব কাজ সজ্ঞানে করে না, বরং অর্ধ জ্ঞান অবস্থায় সে যখন টলতে টলতে চলতে থাকে, তখন করে। এবং শেষে পর্যন্ত সে কোথাও লুটিয়ে পড়ে মারা যায়।

তখন সে কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন বুঝতে

পারছি, আমরাও সেই বিভ্রমে পড়েছিলাম। কখন আমরা শরীর থেকে কাপড় ছুঁড়ে ফেলেছি সে কথা আমি এখনও মনে করতে পারছি না।'

আল আস বললো, 'আমরা দশ বারো দিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছলাম। তার শরীর ততোদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে। চাপাকলির মত তার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার মধ্যে যে মতিভ্রম ঘটেছিল তা ভালো হলো না। সে কখনো ভাল কখনো উদভ্রান্ত হয়ে যায়।

আল্লাহর পথে সে নিজেকে একজন ফানাফিল্লা ব্যক্তি মনে করে। অধিকাংশ সময় সে এবাদত বন্দেগী করে কাটায়। রাতে তার এবাদত বন্দেগীর পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। ইদানিং সে আর ঘরে বন্দেগী করে তৃপ্তি পায় না। সে একদিন এই বাড়ীর মালিক বুজুর্গ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যদি মসজিদুল আকসায় গিয়ে এবাদত করি তবে কি পাপ হবে? মেয়েদের মসজিদে যাওয়া কি অবৈধ?'

বুজুর্গ তাকে বললো, 'না, অবৈধ হবে কেন? মসজিদ আল্লাহর সকল বান্দার জন্য। ওখানে নারীও এবাদত করতে পারে, পুরুষও।'

সেই থেকে সে প্রতিদিন মসজিদে চলে যায়। সারা রাত মসজিদে এবাদত করে সকালে ফজরের নামাজ পড়ে তারপর বাড়ী ফেরে। লোকজন যাতে তাকে মেয়ে বলে চিনতে না পারে সে জন্য সে মোটা কালো কাপড়ে নিজেকে ঢেকে রেখে মসজিদে অবস্থান করে।

সে যখন উদভ্রান্ত হয়ে যায় তখন সে নানা রকম ভবিষ্যতবাণী করতে থাকে। কখনো বলে, 'বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর খৃস্টানদের অধিকার আর কখনো প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না। খোদা তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দেবেন।'

কখনো বলে, 'মুসলমানরা যদি রাতভর এমন ঘুমিয়ে কাটায় তবে আল্লাহর রহমত পাবে কি করে? সুলতান আইয়ুবী, আপনি কোথায়? ঘুমন্ত মুসলমানদের আবার জাগিয়ে তুলুন। আপনি কোনদিন পরাজিত হবেন না। সারা দুনিয়া আপনার পায়ের তলে এসে যাবে। পৃথিবীতে কোন খৃস্টান আপনার ক্ষতি করার জন্য তখন আর বেঁচে থাকবে না।'

এভাবে সে অনেক রকম ভবিষ্যতবাণীই করতে থাকে। তারপর সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে।'

'এই বাড়ীর মালিক কখন বাড়ী ফেরেন? নামাজের পর প্রতিদিনই কি তিনি এমন দেরী করেন?'

'তিনি এখনই এসে যাবেন।' আল আস বললো, 'তিনি নামাজের পর সকালের মুক্ত বাতাসে একটু হাঁটাহাঁটি করেন, তারপর বাসায় এসে কোরআন পড়তে বসেন।'

আরা যখন এসব বলাবলি করছিল তখনই বাড়ীর মালিক সেখানে এসে হাজির হলেন। বয়স্ক এক দরবেশ ধরনের লোক। দেখলেই তাকে ভক্তি করতে ইচ্ছে করে।

এহতেশামের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই মেয়ে আল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে

গেছে। যে অন্তরের সমস্ত আবেগ অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে সে একসময় না একসময় আল্লাহকে পেয়ে যায়। জানি না বান্দার কোন প্রার্থনা আল্লাহ কখন কবুল করেন। হয়তো তার হৃদয় থেকে এমন কোন আবেদন বের হয়েছে যা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। ফলে এক পাপী মেয়ে হয়ে গেছে আল্লাহর এক প্রিয় বান্দী।'

'আপনি কি মনে করেন সে আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, নাকি এটাও তার এক ধরনের অভিনয়?' বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইল এহতেশাম।

'আমার বিশ্বাস, সে পাগলও নয়, প্রতারণাও করছে না। সে তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ইসলামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

'কিন্তু তার এবাদত তো আনাড়ীর এবাদত। ইসলামী এবাদতের সঠিক পদ্ধতি শেখার কোন আগ্রহ তার মধ্যে আপনি কখনো লক্ষ্য করেছেন?'

'না, মরুভূমিতে তার মাথায় যে ভীতি ঢুকেছে তাই হয়তো এখনো তাকে তাড়া করে ফিরছে। আমি তাকে অনেক চেষ্টা করেছি নামাজ শিক্ষা দিতে, কিন্তু সে তার মতই এবাদত করে যাচ্ছে। তবে সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (সা.)কে গভীরভাবে ভালবাসে ও সম্মান করে। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় গায়েবী শক্তি তাকে মদদ যোগাচ্ছে।'

'সে কি মসজিদুল আকসায় নিয়মিত যায়?' এহতেশাম প্রশ্ন করলো।

'না।' পরহেজগার লোকটি বললো, 'আজ রাতেই সে প্রথম মসজিদে গিয়েছে। আল আস সকাল বেলা যখন তার সন্ধানে এলো তখন আমি তাকে জানালাম, সে মসজিদে চলে গেছে। আল আস তার সন্ধানে মসজিদের দিকে চলে গেল। সম্ভবত তোমার সাথে তার রাস্তাতেই দেখা হয়েছে।'

এ কথা শুনে সে আল আসের দিকে তাকাল। বললো, 'আল আস, তুমি যে বললে সে রোজ রাতেই মসজিদে চলে যায়?'

'মেয়েটি নিজেই আমাকে সে কথা বলেছে। আমি তার কথা বিশ্বাস করেই তোমাকে তা বলেছি।'

'এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল মেয়েটি তোমাকে মিথ্যে বলেছে। সে আগে যেমন প্রতারণা করতো আমীরদের সাথে এখনো তেমনি প্রতারণা করছে, তবে আমীরের পরিবর্তে সে প্রতারণার শিকার হয়েছো তুমি।

যাক, এখান থেকেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এ মেয়ে তাহলে কে? এখানে তার কি কাজ? এতদিন সে বায়তুল মোকাদ্দাসে আছে, কোনদিন মসজিদুল আকসায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। আজ রাতে যখন সুলতান আইয়ুবী মসজিদে ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন ছিলেন তখনই শুধু সে মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো কেন?'

'আমি সে উত্তর দিতে পারবো না।' বললো আল আস। এহতেশাম তাকালো পরহেজগার লোকটির দিকে, তিনিও বললেন, 'কি জানি! এর কোন উত্তর জানা নেই আমার।'

এহতেশাম বললো, 'আমার দায়িত্ব এখন মেয়েটাকে হাসান

বিন আবদুল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া। তখন তিনিই বুঝবেন তাকে তিনি নিজের কাছে রাখবেন নাকি সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠাবেন।'

মেয়েটাকে যখন বলা হলো, তাকে এহতেশামের সাথে যেতে হবে তখন সে নিরবে তার সাথে যাত্রা করলো। আল আসও গেল তাদের সাথে। হাসান বিন আবদুল্লাহ তার কাহিনী প্রথমে এহতেশাম ও পরে আল আসের কাছ থেকে শোনলেন। পরে মেয়েটিকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

হাসান বিন আবদুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি অসংলগ্ন ও এলোমেলো কথাবার্তা বলতে লাগলো। হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'দেখো, ভনিতা বাদ দাও। পাগলামীর জায়গা এটা নয়। যা জিজ্ঞেস করি তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করো না।'

মেয়েটি বললো, 'এখন তো সমুদ্র পথে কোন জাহাজ এসে তোমাদের ক্ষতি করার ভয় নেই। তবে কেন আমাকে ভয় পাচ্ছো? আমাকে তোমাদের-সুলতানের কাছে নিয়ে চলো, আমি তার সাথে কথা বলবো। তিনি রাতে যে দোয়া করেছেন সে দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন।'

অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কোন তথ্যই উদ্ধার করা গেলো না। তখন তার বিষয়টি সুলতান আইয়ুবীকে জানানো হলো।

সুলতান আইয়ুবী সেনা অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতি অফিসারদের সামনে তুলে ধরে

বললেন, 'মুসলিম উম্মাহ আজ ভয়ানক এক সংকটময় কাল অতিক্রম করছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও খৃস্টানদের চক্রান্ত বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। সারা বিশ্বে পদদলিত হচ্ছে মানবতা। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে ক্রুসেড বাহিনী।

শুধু মুসলিম দেশগুলোতেই তারা হামলা চালাচ্ছে এমন নয়, বরং ইউরোপীয় দেশগুলোতে যে সব মুসলমান বাস করছে তাদেরও নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে।

আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তারা নানা রকম বাহানা ও অজুহাত সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি 'ইউরোপের একটি গীর্জায় মুসলমানরা হামলা করেছে' এই অজুহাতে সেখানকার কয়েকশ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের গোয়েন্দারা বলছে, মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তারা নিজেরাই গীর্জার ক্ষতি সাধন করে তার দায় চাপিয়ে দিয়েছে নিরীহ মুসলমানদের ওপর।

ইসলাম শুধু মুসলমান নয়, গোটা মানবজাতির নিরাপত্তা, শান্তি ও মানবাধিকারের একমাত্র গ্যারান্টি। অথচ এই ইসলামকে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ আখ্যায়িত করে এর অনুসারীদের ওপর চালানো হচ্ছে জুলুম ও নির্যাতন। নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে কালেমায় বিশ্বাসী, মানবতায় বিশ্বাসী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মানবতাবাদী বিশ্ব সম্প্রদায়কে আবার এক কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে।

এ জন্য যুদ্ধের পাশাপাশি আমাদের কুটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। বিপদ দেখে মুসলমানরা ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার শিক্ষা পায়নি। আমরাও এবার এই পাশবিক শক্তির দম্ভ ও অহংকার গুড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

কুটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমার দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের বলেছি, ক্রুসেড বাহিনী চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। তারা আমাদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ছুটে আসছে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে। এ অবস্থায় তোমাদের কি করতে হবে তা আমি তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি।

আমি তোমাদের বলেছি, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও ঈমান এই তিনটি অস্ত্রে যদি তোমরা নিজেদের সজ্জিত করতে পারো তবে এ অবস্থায়ও আমরাই বিজয়ী হবো। বিজয়ের মালিক আল্লাহ তার গায়েবী মদদ দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

কিন্তু আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আমাদেরকে তার যোগ্য হতে হবে। যদি মুসলিম উম্মাহ কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে পারে তবে আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিতে পারি, দুনিয়ার সমস্ত পাশবিক শক্তি এক হয়েও আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। কারণ পৃথিবীতে মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এর জলবায়ু, আকাশ, বাতাস, বৃক্ষলতা, পাহাড়, নদী, মরুভূমি সবাই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।'

সেনাপতিদের বিদায় দিয়ে তিনি তার রক্ষীকে বললেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে এসো।'

মেয়েটা যখন সুলতান আইয়ুবীর সামনে গেল তখন সে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ সুলতানকে সালাম করলো। সুলতান আইয়ুবী তার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছো? কেন এসেছো?'

সে নির্ভয়ে সুলতানের চোখে চোখ রেখে বললো, 'আমি আপনার ভবিষ্যত দেখছি।'

'ভবিষ্যত সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

মেয়েটি সুলতানের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলো, 'কাল সারা রাত আমি দেখেছি অশ্রুর নদী ও সাগর। তোমার ওই চোখ থেকে সারা রাত অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরেছে। আমি দেখলাম, শত্রুর জাহাজগুলো তোমার অশ্রুজলের সাগরে ডুবে যাচ্ছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রাচীরের কাছেও তোমার দুশমনরা কেউ আসতে পারবে না।'

মেয়েটি বলে যেতে লাগলো, 'রক্ত! রক্ত! রক্ত! চারদিকে রক্তের সাগর বয়ে যাবে। পথেই মারা যাবে পবিত্র ঘরের দুশমনরা। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

থামলো মেয়েটি। তাকালো সুলতানের চোখের দিকে। বললো, 'আল্লাহর হুজুরে সিজদায় পড়ে যে চোখ অশ্রু ঝরায়, আল্লাহর ফেরেশতারা সে অশ্রু মুক্তার মত কুড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সে অশ্রুর মতি কখনও নষ্ট করেন না। যদি নিয়ত

পরিষ্কার থাকে তবে পথও সুগম ও সরল থাকে।’

সুলতান অনেক ভাবে তাকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু মেয়েটাকে তার আসল সত্ত্বায় কোনভাবেই ফিরিয়ে আনা গেল না। সে এমন সব কথা বলতে লাগলো যেন তার চোখে ভবিষ্যতের দৃশ্যগুলো ফুটে রয়েছে।

মেয়েটি আসলে মরুভূমিতেই তার আসল সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছিল। তার অবচেতন মনে খেলা করছিল তার কল্পনার বাস্তবতা। সেই বাস্তবতাই সে বলে যাচ্ছিল প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে।

সুলতান আইয়ুবী বললেন, ‘একে সেই বুজুর্গ লোকের আশ্রয়েই রেখে দাও। তবে এর ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার ব্যবস্থা করবে।’

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মসজিদুল আকসায় আল্লাহর দরবারে যে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিলেন ফেরেশতারা সে অশ্রু বিন্দু সত্যি সত্যি মুক্তার মতো কুড়িয়ে নিয়েছিল, সেই অশ্রু যে আল্লাহপাক কবুল করে নিয়েছিলেন অচিরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। একে একে তার কাছে এমন সব সংবাদ আসতে লাগলো, আল্লাহর গায়েবী মদদের নমুনা দেখে তিনি নিজেই তাজ্জব হয়ে গেলেন।

প্রথমেই তার কাছে খবর এলো, জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক মৃত্যু বরণ করেছেন। তার কয়েকদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন, খৃস্টানদের আরেক সম্রাট কাউন্ট হেনরীও মৃত্যু বরণ করেছেন। এই সম্রাট ক্রুসেড বাহিনীর ঐক্যফ্রন্টের শক্তিশালী

সংগঠক ছিলেন। তিনি শপথ নিয়েছিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসকে মুসলিম আধিপত্য থেকে মুক্ত না করে তিনি কোন নারী স্পর্শ করবেন না।

সম্রাট কাউন্ট হেনরীর মৃত্যু ঘটনা ক্রুসেড বাহিনী গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি ঘটনা তা প্রকাশ করে দেয়। ঘটনাটি ছিল এরকম: সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনীর কমান্ডোরা সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। একদিন তারা ক্রুসেড বাহিনীর দুটি সামুদ্রিক জাহাজ দেখতে পেলো।

জাহাজ দুটো ছিল ফিলিস্তিন উপকূলের সামান্য দূরে। কমান্ডোরা বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে জাহাজ দুটি আটক করে ফেললো। তারা জাহাজে অভিযান চালিয়ে পঞ্চাশজন ক্রুসেড নৌসেনাকে বন্দী করলো।

এই জাহাজে তল্লাশী চালাতে গিয়ে কমান্ডোরা জাহাজে একটি দামী কোট আবিষ্কার করলো। কোটের সাথে লাগানো ছিল হীরা ও জহরতের নানা রকম ইগনেশিয়া। দেখলেই মনে হয় এটা কোন সম্রাট বা রাজার পোশাক।

কমান্ডোরা জানতে চাইলো, 'এই কোট কার?'

কিন্তু কোন ক্রুসেড বন্দী এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হলো না।

এই জাহাজেই ছিল একজন সম্ভ্রান্ত বন্দী। তাকে ক্রুসেডদের এই বাহিনীর কমান্ডার মনে হচ্ছিল। কিন্তু লোকটি নিজেই তা অস্বীকার করে বললো, 'আমাদের কমান্ডার সম্রাট কাউন্ট হেনরি।'

'আর তুমি?'
'আমি সম্রাট কাউন্ট হেনরীর ভাতিজা।' লোকটি জবাব দিল।
'তাহলে উনি কোথায়?'
'উনি গতকাল মারা গেছেন।' জবাব দিল সম্রাট কাউন্ট হেনরীর ভাতিজা।
'এই কোট কি তবে তার?'
সম্রাট কাউন্ট হেনরীর ভাতিজা স্বীকার করলো, 'হ্যাঁ, এটা আমার চাচার কোট।'
ক্রুসেড বাহিনী না চাইলেও এভাবেই সম্রাট কাউন্ট হেনরীর মৃত্যুর খবর পেয়ে গেলো কমান্ডোরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ সুলতানকে দেয়ার জন্য কাসেদ পাঠিয়ে দিল।
কিভাবে সম্রাট কাউন্ট হেনরির মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করতে গিয়ে সুলতানের বাহিনী দুটি ভিন্ন মতামত জানতে পারে। তার ভাতিজার কাছ থেকে প্রথমে জানা যায়, তিনি সাগরে ডুবে মারা গেছেন।
পরে সৈন্যদের সাথে আলাপ করে গোয়েন্দারা যে তথ্য পান তা হচ্ছে, তিনি নদীতে গোসল করতে নেমেছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তাড়াতাড়ি জাহাজে তুলে আনা হয়। কিন্তু জাহাজে তুলে আনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মারা যান।

সুলতান আইয়ুবী যাকে নিয়ে বেশী উৎকন্ঠিত ও চিন্তিত ছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড। রিচার্ড খুব যুদ্ধবাজ সম্রাট

ছিলেন। তিনি কালো রাজকুমার (Black prince) নামে খ্যাত ছিলেন। তাকে সিংহপ্রাণ সম্রাটও বলা হতো। তিনি খুব দুঃসাহসী এবং রণকুশলীও ছিলেন।

প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল বিশাল শরীর। তার বাহু ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। সে জন্য যুদ্ধের ময়দানে তিনি পেতেন অতিরিক্ত সুবিধা। তার তলোয়ার যখন শত্রুর গর্দানে গিয়ে পৌঁছতো শত্রুর তলোয়ার তখনো তাঁর নাগালই পেতো না।

খৃস্টান জগতের সকলের দৃষ্টি ছিল তাঁর উপর। তার সামরিক শক্তি যেমন বিশাল ছিল তেমনি তার নৌশক্তি ছিল বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দী। সুলতান আইয়ুবীর শুধু তাকে নিয়েই ভয় ছিল।

সুলতান আইয়ুবীর মনে পড়লো তার জাদরেল এ্যাডমিরাল হেশামুদ্দিন লুলুর কথা। কিন্তু তিনি নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন না। সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন এ্যাডমিরাল আব্দুল মুহসিন।

সুলতান আইয়ুবী যখন শুনতে পেলেন, সম্রাট রিচার্ড তার শক্তিশালী বিশাল নৌবহর নিয়ে ধেয়ে আসছেন, তখন তিনি তাঁর নৌবাহিনী প্রধান মুহসিনকে খবর পাঠালেন, সে যেন সম্রাট রিচার্ডের সম্মুখীন না হয়। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন তার নৌবহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে।

এরপর এ্যাডমিরাল হেশামুদ্দিন লুলুকে কতগুলো যুদ্ধ জাহাজ ও কিছু দ্রুতগামী নৌকা নিয়ে আসকালান ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, 'শত্রুর জাহাজ ছুটে আসছে। কিন্তু সাবধান, তুমি তাদের সাথে সমানাসামনি লড়াই করতে যেয়ো না। তুমি

শত্রুর জাহাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যখনই তাদের কাউকে একা পাবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

সঙ্গে সামুদ্রিক কমান্ডো বাহিনী রাখবে। প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাবে দক্ষতার সাথে কিন্তু ওদের ফাঁদে পা দেবে না। শত্রুর কোন জাহাজ একা পেলে তাকে যখন আক্রমণ করবে তখন কোন দয়ামায়া দেখাবে না। আপাততঃ ওদের বন্দী করার চেষ্টা না করে জাহাজ ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করবে।'

•

এটা সেই সময়ের কথা যখন সুলতান আইয়ুবী নিদারুণ সমস্যায় জর্জরিত থাকার কারণে রাতের অধিকাংশ সময়ই ঘুমাতে পারতেন না। তিনি তার উপদেষ্টাদের বললেন, 'আমাদের একটি উপকূলীয় শহর কোরবাণী দিতে হবে, আর সে শহরটি হবে আক্রা। আমি শত্রুদের এমনভাবে প্রভাবিত করতে চাই যে, আমাদের যা কিছু আছে সব আক্রাতেই আছে। যদি আক্রা দখল করে নেয়া যায় তবে মুসলমানদের মেরুদন্ডই ভেঙ্গে যাবে। তখন বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কোন সমস্যাই হবে না।'

সুলতান আইয়ুবী তার মজলিশে শুরাকে আরো বললেন, 'আমরা যদি শত্রুদের আক্রাতে এনে জড়ো করতে সক্ষম হই তবে শত্রুরা আক্রার দেয়ালের সাথে মাথা কুটে মরবে, অন্যদিকে নজর দেয়ারই সময় পাবে না।'

উপদেষ্টা পরিষদ তার এ প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করলো।

সুলতান বিশ্বাস করতেন, মসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিনকে কেবল মুসলমানদের অশ্রুই বাঁচাতে পারে। মুমীনের অন্তর নিঙড়ানো অশ্রু আল্লাহ কখনো বৃথা যেতে দেন না। তবে সে অশ্রু হতে হবে নিখাঁদ ও নির্ভেজাল। আর মুমীনকে সে অশ্রুর দাবী পূরণ করতে হবে।

মসজিদুল আকসায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে আসার পর তার অন্তরে প্রশান্তি নেমে এসেছিল। তিনি মনে করেন, আল্লাহর করণীয় আল্লাহ করবেন। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, সামর্থ ও চেষ্টাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

তার মনে পড়ে গেল সেই মেয়েটির কথা, যে মেয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, আমি দেখলাম, শত্রুর জাহাজগুলো তোমার অশ্রুজলের সাগরে ডুবে যাচ্ছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রাচীরের কাছেও তোমার দুশমনরা কেউ আসতে পারবে না।'

সুলতান ভাবছিলেন, সত্যি কি এমনটি ঘটতে পারে না! আমার প্রার্থনায় তো কোন খাঁদ ছিল না। তাহলে আল্লাহ কেন আমাদের বিজয় দেবেন না?

আল্লাহর প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার পরও সুলতান আইয়ুবীর মত খোদাভীরু লোক সম্রাট রিচার্ডের সামুদ্রিক নৌবহরের আগমনের খবরে বিচলিত হয়ে পড়লেন।

তিনি ভেবে পেলেন না, এতো বড় বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা তিনি কিভাবে করবেন? নিজের অক্ষমতা টের পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বিষয়টি আল্লাহ ওপর ছেড়ে দিলেন।

বললেন, 'আয় আল্লাহ, আমার যতটুকু সাধ্য ছিল আমি করেছি। আরো যদি কিছু করার থাকে সে বুদ্ধি তুমি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দাও।'

সম্রাট রিচার্ড ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। এক রাতে এক ভয়াবহ তুফান তার নৌবহরকে ঘিরে ফেললো। ঝড়ে তার সমস্ত জাহাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার নৌবহরে ছোট বড় পাঁচশ বিশটি জাহাজ ছিল।

তার মধ্যে অনেকগুলোই ছিল বড় বড় যুদ্ধজাহাজ। এসব জাহাজ সৈন্য, ঘোড়া, অস্ত্র, রসদপত্র ও অন্যান্য মালপত্রে বোঝাই ছিল।

ঝড় এত প্রচন্ড ছিল যে, সম্রাট রিচার্ডের জীবনও বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই তুফানের মধ্যে পড়ে জাহাজগুলো এলোমেলো হয়ে গেলো। ঝড় শেষ হওয়ার পরও কয়েকদিন লেগে গেল সেগুলো একত্র করতে।

অনেক অন্বেষণের পর জাহাজগুলো একত্রিত করে দেখা গেল পঁচিশটি বড় জাহাজের কোন হদিস নেই। ধারণা করা হলো, সেগুলোর সবই সমুদ্রে ডুবে গেছে।

এর মধ্যে ছিল দু'টি বিশালকায় নামকরা জাহাজ। তাতে এত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম ছিল, যা হারিয়ে সম্রাট নিজেই দিশেহারা হয়ে গেলেন। কারণ এতে ছিল তার আগুনতি ধন সম্পদ, অর্থ কড়ি ও প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র। এই ঝড় তার সবকিছুই ভূমধ্যসাগরে তলিয়ে দিল। এতে যে কেবল মূল্যবান

সম্পদ ছিল তাই নয়, সম্রাটের বাগদত্তা স্ত্রী এবং তার এক বোনও ছিল সেই জাহাজে। ফলে জাহাজ দুটো হারিয়ে সম্রাট রিচার্ড অপুরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন তো হলেনই সেই সাথে স্বজনও হারালেন। আর এই ক্ষতি তাকে প্রচন্ড রকম বিমর্ষ করে তুললো।

এই ব্যথাতুর মন নিয়েই সম্রাট রিচার্ড তার বহর নিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপে এসে পৌঁছলেন এবং জাহাজগুলোকে এখানে নোঙর করার হুকুম দিলেন। এখানে এসে তিনি জানতে পারলেন, ঝড়ের কবলে পড়ে তার নৌবহরের যে জহাজগুলো হারিয়ে গিয়েছিল তার তিন চারটি সাইপ্রাসের কূলে চলে আসতে পেরেছিল এবং সেগুলো এখনো এখানেই নোঙর করা আছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, যে জাহাজে তাঁর যুবতী বোন জিয়ান ও বাগদত্তা রাণী বিরাঙ্গারিয়া ছিল সে জাহাজটিও রক্ষা পেয়েছে এবং তারাও বেঁচে আছে।

এদের দু'জনের ব্যাপারেই তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, তারা ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গেছে। তাদের বেঁচে থাকার খবরে তিনি পঁচিশটি বড় বড় জাহাজ হারানোর বেদনা ভুলে গেলেন। তার মুখে অনেক দিন পর আবার হাসি দেখা গেল।

কিন্তু তখনো তিনি জানতেন না, তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ানক এক দুঃসংবাদ। যখন জানতে পারলেন তখন তার সেই হাসি আবার বিষাদে রূপ নিল এবং তিনি প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

তিনি জানতে পারলেন, তার রাণী ও বোনকে বহনকারী

জাহাজসহ চারটি জাহাজই নিরাপদে কূলে এসে ভিড়তে পেরেছিল। কিন্তু তখনই দেখা দিল নতুন সমস্যা।

সাইপ্রাসের সম্রাট আইজাক কূলে ভিড়া জাহাজের সমস্ত মালপত্র উঠিয়ে নিলেন এবং জাহাজের সকল যাত্রীকে ধরে নিয়ে বন্দী করলেন। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রিচার্ডের রাণী ও বোন।

আইয়ুবীকে শায়েস্তা করতে এসে পথে অন্য কারো পেছনে শক্তি ক্ষয় করতে প্রস্তুত ছিলেন না সম্রাট রিচার্ড। কিন্তু বাধ্য হয়ে রিচার্ডকে আইজাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হলো।

যুদ্ধে আইজাক পরাজিত ও বন্দী হলেন। বন্দী আইজাককে এনে রাখা হলো এক তাবুতে।

গভীর রাত। আইজাক বন্দী হয়ে আছেন তার নিজের দেশে। তাবুতে শুয়েও তার ঘুম এলো না। তিনি অপমান ও মর্ম যাতনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। তখনই তার মনে হলো, আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না কেন? এটা আমার নিজের দেশ। এর পথঘাট সবই আমার চেনা। দেশের মানুষ আমার প্রজা। একবার এই তাবু থেকে পালাতে পারলে রিচার্ডের সৈন্যদের সাধ্য হবে না আমাকে ধরার। আমাকে আশ্রয় দেবে এ দেশের প্রতিটি নাগরিক। তাহলে আর বসে আছি কেন?

তাবুর পাহারাদার দু'জন ঘুম তাড়াবার জন্য তাবুর এক পাশে বসে গল্প করছিল। যেদিকে কোন পাহারা ছিল না সম্রাট আইজাক সেদিকের তাবুর নিচ দিয়ে গড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে

এলেন। তারপর খুব সন্তর্পনে একটু একটু করে সরে যেতে লাগলেন তাবুর কাছ থেকে। এক সময় রিচার্ডের সৈন্যদের দৃষ্টির বাইরে চলে এলেন তিনি, পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক দ্বীপে।

রাণী এবং রাজকুমারীকে বন্দী করায় এমনিতেই সম্রাট রিচার্ড আইজাকের ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। আইজাকের পলায়ন তার আত্মসম্মানে ঘা দিল, তিনি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

তিনি তার বিশাল বাহিনীকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আইজাককে পাকড়াও না করে এক পাও তিনি সামনে এগুবেন না আর।

রিচার্ডের বাহিনী আইজাকের খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ছুটে গেল দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। দিন পেরিয়ে যেতে লাগলো। আইজাকের কোন সন্ধান পাচ্ছেন না সম্রাট রিচার্ড।

সপ্তাহ পার হয়ে গেল। পার হলো দশদিন। দুই সপ্তাহ অতিক্রম করার পরও তার কোন খোঁজ না পেয়ে সম্রাট রিচার্ড চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আমি কি ক্ষোভের বশে এখানে সময় নষ্ট করছি? তিনি সৈন্যদের বললেন, 'তোমাদের আর পাঁচ দিন সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আইজাককে আমার সামনে হাজির করতে না পারলে তোমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে আমি বলতে পারি না।'

আজ সম্রাট রিচার্ডের বেঁধে দেয়া সময়ের শেষ দিন। সৈনিকরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ব্যর্থতার অপমান ও ক্ষোভে কালো হয়ে গেল সম্রাটের চেহারা। তিনি নিজের তাবুর মধ্যে গিয়ে

সেই যে ঢুকলেন আর বের হলেন না।

রিচার্ডের সৈন্যরা সাগর তীরের প্রতিটি গ্রাম ও দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই পেলো না তারা। তবু হাল ছাড়লো না, একবার যেখানে খুঁজে গিয়েছিল সেখানেই আবার নতুন করে খুঁজতে লাগলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। একদল সৈনিক এক দ্বীপে তাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছিল, তাদের সামনে পড়ে গেল একদল জেলে। এই জেলেদের একজনের ওপর আটকে গেল এক সৈনিকের চোখ। লোকটি জেলেদের বেশে থাকলেও অন্যদের সাথে তার কোন মিল ছিল না। তার চেহারা সুরত তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জেলেদের পোশাক পাল্টে এ লোককে ভদ্রলোকদের পোশাক পরিয়ে দিলে সে কোন অভিজাত বংশের সর্দার হতে পারবে।

জেলেদের দলটিকে আটকালো সৈন্যরা। জানতে চাইলো তারা এদিকে সম্রাট আইজাককে দেখেছে কি না? তারা অস্বীকার করলো। কিন্তু সন্দেহ গেলো না সেই সৈনিকের। সে ওই লোককে বন্দী করে নিয়ে এলো সম্রাট রিচার্ডের সামনে। পাহারাদাররা তাকে দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো, 'ইনিই তো সম্রাট আইজাক!'

সম্রাট রিচার্ড যখন ফিলিস্তিনের উপকূলে এসে পৌঁছলেন ততোক্ষণে ক্রুসেডদের সম্মিলিত বাহিনী আক্রা শহর অবরোধ করে নিয়েছে। এই অবরোধকারী বাহিনীর প্রথমেই ছিলেন গে

অব লুজিয়ানের সেনাদল, যাকে রাণী সাবিলা সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আর কখনো যুদ্ধ করবে না এই শর্তে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

এরপর তাদের সাথে এসে যুক্ত হলেন ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপস অগাষ্টাস ও তার বাহিনী। এই দুই শক্তি মিলে আক্রার অবরোধকে দৃঢ়তর করে তুলল। এ সময় শহরের মধ্যে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার আর তাদের কাছে এক বছর চলার মতো খাদ্যশস্য মজুত ছিল।

এই সর্বাত্মক অবরোধের সুচনা ঘটে ১১৮৯ সালের ১৩ আগষ্ট। আক্রা ছিল খুবই সমৃদ্ধ শহর। রাজা বাদশাহদের থাকার মতো আলীশান মহলগুলো ছিল সাগর তীরে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ শহরকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করে নিয়েছিল। এ শহরের তিন দিকেই ছিল খোলা সমুদ্র, মাত্র একদিকে ছিল শহরের শক্ত প্রতিরক্ষা প্রাচীর।

বলতে গেলে সমুদ্রের বিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের সবটাই ঘেরাও করে নিয়েছিল খৃস্টান বাহিনীর নৌবহর। স্থলবাহিনীর খৃস্টান সদস্যরা আস্তানা গেড়েছিল শহর রক্ষা প্রাচীরের বাইরে, নিরাপদ দূরত্বে। এভাবে জল ও স্থল পথের সমস্ত রাস্তা ক্রুসেড বাহিনী বন্ধ করে দিয়ে ভাবলো, এবার সিংহকে খাঁচায় আটকানো গেছে।

সুলতান আইয়ুবী তার তৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করছিলেন, তিনি শহরেই আছেন, কিন্তু মূলত তিনি শহরে ছিলেন না। ক্রুসেড বাহিনী সুলতান আইয়ুবীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে

ফেলতে পেরেছে ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল। শিকারী যেমন হিংস্র প্রাণীকে খাঁচায় আটকাতে পারলে নিরাপদ বোধ করে তেমনি নিশ্চিন্ততা নিয়ে তারা চারদিক থেকে শহর ঘেরাও করে বসে ছিল। আজই সুলতানকে হাতের মুঠোয় পেতে হবে এমন কোন তাড়াহুড়ো ছিল না তাদের মধ্যে। তারা ভাবছিল, কিছুদিন যাক। খাদ্য ও রসদের ঘাটতি দেখা দিক মুসলিম শিবিরে। না খেতে পেরে শুকিয়ে মরুক। তারপর এক সময় তারা আত্মসমর্পন করবেই।

এ ধরনের ভাবনার কারণেই তারা শহরে আক্রমণ করার কোন গরজ অনুভব করলো না। বরং তারা মনে করলো, শহরের দিকে চোখ রেখে অলসভাবে সময় পার করে দিতে পারলেই একদিন বিজয় এসে চুমু খাবে তাদের পায়ে।

সুলতান আইয়ুবী তখন শহরের বাইরে এক নিরাপদ ও গোপন জায়গায় বসে লক্ষ্য করছিলেন শত্রুদের গতিবিধি। তিনি তার কর্ম তৎপরতার দ্বারা শত্রু বাহিনীকে আক্রার দিকে টেনে আনতে পেরেছেন, এটাকে তার প্রথম বিজয় বলে গণ্য করলেন। এবার তিনি তার আসল খেলা শুরু করলেন।

ক্রুসেড বাহিনী যখন অবরোধকে গুছিয়ে নিয়ে সুস্থির হয়ে বসলো তখন তিনি তার কমান্ডো বাহিনীকে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমরা কাজে নামতে পারো।'

একদিন রাত। অবরোধকারী সৈন্যরা রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ মধ্য রাতে হৈ চৈ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাদের।

ওরা তাকিয়ে দেখলো শহরের ফটক তেমনি বন্ধ আছে। সৈন্য নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই শহরের ভেতর। স্থলভাগের অবরোধকারীদের পেছন দিকের কিছু তাবু জ্বলছে। ওইসব তাবুতে তাদের খাদ্যসামগ্রী ও সরঞ্জামাদি রাখা ছিল। আশেপাশে তারা কোন মুসলমান সৈন্য দেখতে পেলো না।

তবে গে অব লুজিয়ান ও সম্রাট অগাস্টাসের বুঝতে বাকী রইলো না, সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনী তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল। তাদের টার্গেট ছিল রসদভান্ডার, তাই তারা সৈন্যবাহিনীর ওপর আঘাত হানেনি।

পরদিন তারা পাহারা আরো জোরদার করলো। বিশেষ করে পেছন দিকের সুরক্ষার দিকে মনযোগ দিল বেশী।

সেই রাতেই আবার হামলা হলো। তবে এবারের হামলা আরো জোরালো। হামলা হলো এক পাশে এবং ঝড়ের বেগে এসে ঝড়ের বেগে হারিয়ে গেল কমান্ডো বাহিনী। তছনছ করে দিয়ে গেল অনেক তাবু।

পরের রাত। ক্রুসেড বাহিনীর পাহারাদাররা দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ তাকিয়েছিল শহরের দিকে অন্য ভাগ তাদের পেছনটা দেখছিল। হঠাৎ মাঝরাতে ক্যাম্পের ডান পাশে তারা দেখতে পেলো মুহূর্তে কতগুলো মশাল জ্বলে উঠেছে এবং বাঁধা দেয়ার আগেই তারা অতর্কিতে ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পের ভেতর। আজও তারা ঝড়ের বেগে একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তবে যাওয়ার আগে অনেক কয়টা তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে

গেল। সামনে যাকে পেলো হত্যা করে গেল। ক্যাম্পের আগুনে ছুটাছুটি করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরলো কয়েকজন। আহত হলো বেশ কিছু সৈন্য।

ওরা বুঝলো, সুলতান আইয়ুবী ভেতরে থাকলেও তার কিছু কমান্ডো সৈন্য বাইরে রয়ে গেছে। হয়তো তারা শহরে প্রবেশ করতে চায়। শহরে ঢুকার রাস্তা বের করার জন্যই বার বার হামলা করছে।

সম্রাট অগাস্টাস বললেন, 'গে অব লুজিয়ান, ওদের শহরে ঢুকার মতো একটা রাস্তা বের করে দাও, দেখবে কমান্ডো আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে।'

পরের রাতে তারা শহরের ফটক বরাবর অংশটা এমনভাবে হালকা করে দিল, যাতে সুলতানের দলছুট কমান্ডোরা শহরের ফটক পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু তারা তখনও বুঝতে পারেনি, সুলতান আইয়ুবী শহরের ভেতরে নয়, বাইরে আছেন।

খৃস্টানদের এ পরিকল্পনা সফল হলো না, কেউ ঢুকলো না শহরে। ঢুকার কথাও নয়। এভাবেই প্রতি রাতে, কখনো দু'একদিন বিরতি দিয়ে অবরোধকারী বাহিনীর ওপর মুসলমানদের আক্রমণ চলতেই থাকলো। তখন ওরা বুঝলো, সুলতান আসলে শহরের ভেতরে নেই, তিনি বাইরেই আছেন এবং এসব হামলা তিনিই পরিচালনা করছেন।

এ কয়দিনের হামলায় ক্রুসেড বাহিনীর বেশ ক্ষতি হয়ে গেল। তারাও প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিল এবং প্রতিরোধ করতে শুরুও

করলো। এতে মুসলমানদেরও কয়েকজন কমান্ডো শহীদ হয়ে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবীর সবচে বড় অসুবিধা ছিল, তাঁর সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম। তারপরও আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তিনি মনে মনে আশা করলেন, অবরোধ দীর্ঘদিন ধরে চললে ক্রুসেডদের শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাবে। তিনি কমান্ডো আক্রমণের মাধ্যমে যতটা না তাদের ক্ষতি করছিলেন তারচে বড় টার্গেট ছিল তার, দুশমনের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া। তিনি একটু একটু করে তাদের শক্তি নিঃশেষ করতে চাচ্ছিলেন। এতে করে খৃস্টান সৈন্যদের মনে ভীতিটা একটা রোগের মতোই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সুলতান আইয়ুবী হিসাব করে দেখলেন, আঘাত হানার জন্য আর অপেক্ষা করলে ক্রুসেড বাহিনী নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্যোগ নিতে পারে।

১১৮৯ সালের ৪ অক্টোবর। দিন গিয়ে রাত এলো। সুলতান আইয়ুবী তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ক্রুসেড বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ চালালেন। ক্রুসেড বাহিনীও সতর্ক এবং প্রস্তুত ছিল। শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এক রাতেই নিহত হলো ক্রুসেড বাহিনীর নয় হাজার সৈন্য।

কিন্তু তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। মাত্র নয় হাজার সৈন্য শেষ হওয়ায় তাদের তেমন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হলো না। আক্রা শহর তাদের দখলে আসবে এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ সংশয়

সৃষ্টি হলো না তাদের মধ্যে। বরং তাড়াতাড়ি যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় খুশীই হলো তারা। এভাবে লড়াই শুরু না হলে মোকাবেলা হতো কি করে? আর মোকাবেলা না হলে কি করে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে?

ক্রুসেড বাহিনী বীর বিক্রমে আইয়ুবীর জানবাজদের হামলা প্রতিহত করে চললো। কিন্তু সাহস করে তারা কেল্লা বা শহর আক্রমণ করতে গেলো না। কারণ তারা যতোবারই শহরের প্রাচীরের দিকে এগুতে চেষ্টা করেছে ততোবারই মেনজানিকের অগ্নিগোলা ও তীরের বৃষ্টি তাদের ছেকে ধরেছে। বিজয় যেখানে নিশ্চিত সেখানে ধৈর্যহারা হয়ে অযথা নিজেদের আরো কিছু সৈন্য ক্ষয় করার কোন মানে হয় না। এই ব্যাপারে সম্রাট অগাস্টাস ও গে অব লুজিয়ান দু'জনই একমত।

রাত শেষে ভোর হলো। ক্রুসেড বাহিনী ময়দানের দিকে তাকিয়ে দেখলো তাদের হাজার হাজার সৈন্য পড়ে আছে ময়দানে কিন্তু আইয়ুবীর বাহিনীর কোন ছায়াও নেই আশেপাশে।

সম্রাট অগাস্টাস বললেন, 'না, এভাবে মার খাওয়ার কোন মানে হয় না। শহর আক্রমণ করতে হবে। শহরের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই লুকোচুরি খেলা থামাবে না আইয়ুবী।'

'তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? আসুন এখনই হামলা করে বসি। এতগুলো সৈন্য এক সাথে এগিয়ে গেলে শহরের পতন ঘটাতে আমাদের এক ঘন্টার বেশী লাগবে না।' বললেন গে অব লুজিয়ান।

ক্রুসেড বাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে হামলা করলো শহরের ওপর। কিন্তু তারপরও তাদের সৈন্যরা প্রাচীরের কাছে ভিড়তে পারলো না। কারণ মুসলমান সৈন্যরা তাদের উপর মুষলধারে তীর বর্ষণ করতে লাগলো।

এই তীরের জাল ভেদ করে জীবন নিয়ে শহরের পাঁচিলের কাছে পৌঁছা সম্ভব নয় কোন মানুষের পক্ষে। এ ছাড়া মুসলমান সৈন্যরা পেট্রোল ভর্তি হাড়ি নিক্ষেপ করলো খৃস্টানদের দিকে, যার লেলিহান শিখা টপকে প্রাচীরের কাছে পৌঁছা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে।

ফলে ছয় ল্যাখ সৈন্যের যে বিশাল বাহিনী পঙ্গপালের মত [illegible]ছিল শহরের দিকে তারা আরো কয়েক হাজার সাথীকে ময়দানে [illegible] রেখে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো। সম্রাট অগাস্টাস ও সম্রাট গে অব লুজিয়ান উর্ধতন সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

সম্রাট অগাস্টাস বললেন, 'আইয়ুবীকে আর ছাড় দেয়ার কোন উপায় নেই। সে আমাদের বহু সৈন্যকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে। সুযোগ দিলে সে এভাবে একটু একটু করে আমাদের খেয়ে ফেলবে। অতএব শহরে আমাদের ঢুকতেই হবে। কিভাবে শহরে প্রবেশ করা যায় সে বুদ্ধি বের করো।'

অনেক গবেষণার পর এক অফিসার একটি বুদ্ধি আবিষ্কার করলো। সে তার চিন্তা পেশ করলো বৈঠকে। সবাই একমত হলো তার প্রস্তাবে। শুরু হলো সে প্রস্তাব বাস্তবায়নের মহা তোড়জোড়।

ক্রুসেড বাহিনী প্রাচীর টপকানোর যে নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছে তা সফল করার জন্য তারা কয়েক দিনের পরিশ্রমে একটি বড় গম্বুজওয়ালা কাঠের ঘর তৈরী করলো। এই ঘরের নিচে অনেকগুলো কাঠের চাকা লাগানো হলো। সে ঘরটি এত বড় ছিল যে তাতে কয়েকশ সৈন্য এক সাথে থাকতে পারে। ঘরের গম্বুজটি অনেক উঁচু। ওখান থেকে সহজেই প্রাচীরের ওপর লাফিয়ে নামা যাবে।

একদিন ভোরে একদল খৃস্টান সৈন্য ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। তারা ঘরে ঢুকতেই অন্য আরেকদল সৈনিক ঘরটি শহরের পাঁচিলের দিকে ঠেলতে শুরু করলো। শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনী অবাক হয়ে দেখলো এই অদ্ভুত কান্ড। তারা ঘরের দিকে তাক করে তীর ছুঁড়তে শুরু করলো।

তীর সব কাঠে বিদ্ধ হচ্ছিল, সে জন্য সৈনিকদের তাতে কোন ক্ষতি হলো না। তখন সেই ঘর তাক করে মুসলমানরা মেঞ্জানিক কামান দাগতে শুরু করলো।

ঘরটি প্রাচীরের আরো কাছে চলে এলো। এ সময় এক মুসলিম সেনা কমান্ডার বললো, 'না, এভাবে হবে না।' এই কমান্ডার ঘরের দিকে পেট্রোল হাড়ি নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল।

সে দেয়ালের কাছাকাছি চলে আসা ঘরটির দিকে তাক করে মেনজানিক দিয়েপেট্রোল হাড়ি ছুঁড়ে মারলো। হাড়িটি ঘরের গায়ে লেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। পেট্রোল ছড়িয়ে পড়লো ঘরের কাঠের দেয়ালে।

ঘরের ভেতর থেকে কয়েকশো সৈন্য তীর ছুঁড়তে লাগলো পাঁচিলের দিকে। সেই তীরের জবাবে তীর ছুঁড়ছিল মুজাহিদরাও। সেই কমান্ডার এক মুজাহিদকে বললো, 'অগ্নিতীর ছুঁড়ে মারো।'

এক মুজাহিদ দ্রুত ঘরের দিকে অগ্নিতীর ছুঁড়ে মারলো। জ্বলন্ত তীরটি কাঠের ঘরের দেয়াল স্পর্শ করতেই সেখানে দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন। মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। একে তো কাঠের ঘর তার ওপর সেই কাঠ পেট্রোল ভেজা। ফলে দেখতে দেখতে ঘরটি হারিয়ে গেল বিশাল অগ্নিকুন্ডের ভেতর। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত সৈন্যসহ ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

খৃস্টানদের এ অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হলে তারা শহরে প্রবেশের নতুন উপায় সন্ধান করতে লাগলো। শহর প্রাচীরের বাইরে একটি বড় পরিখা ছিল। এই খন্দক পার হওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াল খৃষ্টানদের জন্য। তারা সে খন্দকটি মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলার উদ্যোগ নিল।

শত শত ক্রুসেড সৈন্য লেগে গেল মাটি ভরাটের কাজে। শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তীর সে পর্যন্ত পৌঁছতো না। মুজাহিদ বাহিনীর এক কমান্ডার বললো, 'যারা আগে শহীদ হতে চাও তারা আমার সাথে এসো।'

সে একদল মুজাহিদ নিয়ে ফটক পার হয়ে চলে এলো শহরের বাইরে। এসেই এ দুঃসাহসী সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রুসেড

বাহিনীর উপর। তাদের তীব্র আক্রমণে শত শত খৃস্টান সৈন্য তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো সেই খন্দকের ভেতরেই।

খৃস্টান সেনারাও মরিয়া হয়ে উঠলো। তারাও পাল্টা তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার শপথ নিয়েই ছুটে গিয়েছিল শহরের বাইরে। ফলে সেখানে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেল।

দেখা গেল সেই খন্দকটি এবার মাটির পরিবর্তে খৃস্টানদের মৃত লাশে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। খৃস্টানরা সেই লাশ সরানো বা দাফনের সুযোগ পেলো না। তারা খন্দকের ভেতর কয়েক হাজার লাশ রেখে পিছু হটতে বাধ্য হলো। সুলতান আইয়ুবীর জানবাজ কমান্ডো বাহিনী তাদের ধাওয়া করে এগিয়ে গেল খন্দক পর্যন্ত। কিন্তু এত কিছুর পরও খৃস্টানদের অবরোধ দুর্বল না হয়ে বরং আরো দৃঢ় হলো। সামান্য মুসলিম সৈন্যের এই প্রতিরোধ তাদের ক্ষিপ্ত করে তুললো।

শহরবাসী সৈন্যদের সাথে সুলতান আইয়ুবীর যোগাযোগ চলছিল পত্রবাহী কবুতরের মাধ্যমে। অপর এক যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এক লোক, যার নাম ছিল ইশা আল উমওয়াম। সে চিঠি কোমরে চামড়ার ওয়াটারপ্রুফ বেল্টে ঢুকিয়ে সমুদ্র সাঁতরে শহরে প্রবেশ করতো। রাতের অন্ধকারে সে শহরে আসতো, অন্ধকারেই আবার বিদায় হয়ে যেতো। কখনো প্রয়োজন হলে থেকে যেতো শহরেই।

শত্রুদের জাহাজগুলো ঘিরে রেখেছিল আক্রা শহর। তাকে শত্রুদের নোঙর করা জাহাজের গা ঘেঁষে চলাচল করতে হতো। এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে চিঠি আদান প্রদান করতো।

সে শহরে নিরাপদে পৌঁছতে পারলে আকাশে কবুতর উড়িয়ে দিত। পায়রাটি উড়ে মুসলমানদের শিবিরে চলে এলে তারা বুঝতে পারতো, ইশা নিরাপদেই শহরে পৌঁছেছে। তারাও তখন তার কবুতর উড়িয়ে ফেরত পাঠাতো।

একদিন রাতে সে এমনি সাঁতার কেটে আক্রা শহরে যাওয়ার জন্য রওনা হলো। ওখানে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে দেয়া হলো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একটি চিঠি। সে স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটি কোমরে বেঁধে সমুদ্রে নেমে পড়লো।

সে স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে যাওয়ার পর সুলতান আইয়ুবী তার পাঠানো কবুতরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন কবুতর তার কাছ থেকে ফেরত এলো না। সুলতান চিন্তিত হলেন। পরের দিনও কোন কবুতর ফেরত না এলে তিনি মনে করলেন, সে ধরা পড়েছে।

কয়েকদিন পর শহরে সংবাদ পৌঁছলো, ইশার লাশ আক্রা শহরের উপকূলে ভাসছে। সোনার মোহারগুলো তখনো তার দেহের সাথে বাঁধা। লাশের অবস্থা খুবই খারাপ। ঘটনা হচ্ছে, সে সোনার ভারে সাঁতার দিতে না পারায় ডুবে গিয়েছিল।

আক্রার শাসনকর্তা মীর কারাকোশ ও সেনাপতি আলী ইবনে আহমদ মাশতুত দু'জনই ছিলেন জিন্দাদীল মুজাহিদ। তারা

বরাবর সুলতানকে এই খবর পাঠাতে লাগলেন, 'সুলতান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পরিস্থিতি যত নির্মম ও কঠিনই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই আমরা অস্ত্রসমর্পন করবো না। তবে শহরের এই সামান্য সৈন্য দিয়ে অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়া হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি বাইরে থেকে খৃস্টানদের উপর প্রবল চাপ বজায় রাখলে তারা শহরে আক্রমণ করার ফুসরত পাবে না। নইলে তারা শহরে আক্রমণ করে বসতে পারে। খৃস্টানরা প্রবল স্রোতের মতো শহরে ঢুকতে শুরু করলে সামান্য ক'জন মুজাহিদের পক্ষে এখানে টিকে থাকাই কঠিন হবে।' তারা আরো লিখলেন, 'অবরোধ দীর্ঘায়িত হলে শহরে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে হবে। সৈন্য সাহায্য পাঠানো সম্ভব হলে শহরের ভেতর থেকেও অবরোধকারীদের ওপর হামলা করা সম্ভব।'

সুলতান আইয়ুবী বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবলেন। কিন্তু শহরে সাহায্য পাঠানো এক জটিল সমস্যা। চারদিক ঘেরাও করে রেখেছে খৃস্টানরা। এ অবস্থায় ইচ্ছে করলেও তিনি যখন তখন সাহায্য পাঠাতে পারছেন না। এমন কোন ফুটো নেই, যে ফুটো দিয়ে তিনি সৈন্য বা খাদ্য সাহায্য ভেতরে পাঠাবেন।

ইশা আল উমওয়ামের শাহাদাতের পর সুলতান আইয়ুবী আরো একবার স্থলভাগের অবরোধকারীদের ওপর চড়াও হলেন। তবে এবার কেবল আঘাত হেনে শত্রুদের বিপুল ক্ষতি সাধনই তার লক্ষ্য ছিল না বরং অবরোধের জবাবে পাল্টা অবরোধ করে বসলেন তিনি।

খৃস্টানদের সামনে শহর এবং শহরে অবস্থানকারী সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা আর পেছনে স্বয়ং সুলতান আইয়ুবী এবং তার ক্ষুদ্র বাহিনী।

দু'পাশে শত্রুবেস্টিত হলেও খৃস্টানদের দুর্ভাবনার তেমন কিছু ছিল না। কারণ তখনো ওরা ভাবছিল, সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী এতই নগন্য যে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

খৃস্টানদের বিশাল বাহিনীর তুলনায় মুসলমানদের বাহিনী হাতির কাছে মশার সমান। কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ একটাই, আইয়ুবীর বাহিনী বসে থাকে না এবং ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিও নেয় না। বরং তারা পরিকল্পিতভাবে একটু একটু করে খৃস্টান বাহিনীকে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

সুলতান আইয়ুবীর অবরোধের পর দু'পক্ষেই আবার তুমুল সংঘর্ষ হয়। ব্যাপক ক্ষতি হয় উভয় পক্ষে। তারপর সংঘর্ষের প্রচন্ডতা কমে এলে দুই বাহিনী আবার যার যার অবস্থানে দৃঢ় হয়ে দঁড়িয়ে যায়।

এ সময় সুলতান আইয়ুবীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। তার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। অসুখের কারণ, অত্যধিক রাত্রি জাগরণ ও শরীরের উপর বেশী অত্যাচার। তৃতীয় কারণ ছিল মানসিক। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। দু'পক্ষেরই সৈনিকদের মৃত লাশ স্তুপ হয়ে পড়ে আছে ময়দানে। পঁচা ও গলিত লাশের দুর্গন্ধ এত বেশী যে, সেখানে নিঃশ্বাস নেয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো।

এ সব কারণে সুলতান আইয়ুবীর শরীর বেশ খারাপ হয়ে

গেলো। তিন চার দিন তিনি শয্যা থেকে উঠতেই পারলেন না। তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, হায়! আক্রা শহর কি হাত ছাড়া হয়ে যাবে?

সুলতান আইয়ুবী তার তাবুতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। তার মুষ্ঠিমেয় কমান্ডো সৈন্য তখনো আক্রার কাছে বিশাল ক্রুসেড বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন কোন পক্ষই আর দয়ামায়ার ধার কাছ দিয়ে যাচ্ছে না। যে যেখানে যেভাবে পারছে শত্রু নিধন করে যাচ্ছে।

সুলতান আইয়ুবী দশ হাজার সৈন্য শহরে রেখে বাইরে থেকে এতদিন ধরে লড়াই করে যাচ্ছেন তার হাতে গড়া কমান্ডো বাহিনী নিয়ে। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রায় সৈন্যদের সমানই।

এদের অনেকেই এর মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে। অল্প যে ক'জন বেঁচে আছে তারা ভাসছে রক্তের ওপর। সম্ভবত ফিলিস্তিনের ইতিহাস সবচাইতে রক্তাক্ত সময় পার করছিল সেই দিনগুলোতে।

যুদ্ধ চলছিল প্রতিদিন। কোন পক্ষেই অবরোধ সরানোর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। খৃস্টানরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য, মুসলমানরাও আশাবাদী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সহায় থাকবেন।

সুলতান আইয়ুবী শহরের সৈন্যদের কথা ভাবলেন। আসার সময় তিনি সেখানে যে দশ হাজার সৈন্য রেখে এসেছিলেন যুদ্ধে তাদের অনেকেই শহীদ হয়ে গেছে। তবে বাকীরা

এখনো লড়ছে ঈমানের জোরে। এই ঈমানী শক্তির কোন তুলনা নেই। তাদের অর্ধেক সাথী আল্লাহর দরবারে রওনা হয়ে যাওয়ার পরও তাদের সাহস ও তৎপরতায় কোন ভাটা পড়েনি। অপর পক্ষে এ লড়াই শুরু হওয়ার সময় অবরোধকারী ক্রুসেড বাহিনী ছয় লাখ সৈন্য নিয়ে ময়দানে নেমেছিল। এর মধ্যে তাদের এক লাখের মতো সৈন্য মারা গেছে। তার পরও তাদের সৈন্য এখনো বেঁচে আছে পাঁচ লাখের মতো।

সুলতান পাঁচ হাজার মুজাহিদের হাতে এক লাখ খৃস্টান সৈন্য নিহত হওয়ার পরও খুশী হতে পারলেন না। তিনি হিসেব করে দেখলেন, এই হারে চলতে থাকলে ভেতরের দশ ও বাইরের দশ মোট বিশ হাজার সৈন্যের হাতে মারা যাবে চার লাখ। কিন্তু তখনো খৃস্টানদের হাতে থেকে যাবে দুই লাখ সৈন্য। তাই তিনি যুদ্ধের ধারা পাল্টাবার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন।

সুলতান আইয়ুবী ক্রুসেড বাহিনীর পশ্চাতে অর্থাৎ শহরের বাইরে ছিলেন বলে এতদিন যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে যে দশ হাজার কমান্ডো ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মামলুক বংশের। এদের উপর সুলতানের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

তারা তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। ক্রুসেড বাহিনীর উপর উপর্যুপরি প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে তাদের। কিন্তু বিশাল বাহিনীকে এই ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে এখনো অপসারণ করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। সুলতান গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন।

একে তো তাদের সৈন্য সংখ্যা বহুগুণ বেশী, তার ওপর তারা আইয়ুবীর অশ্বারোহী বাহিনী যাতে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে না পারে সে জন্য পথে নানা জায়গায় বড় বড় গর্ত করে রেখেছে। এই সব খন্দক সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের জন্য বিরাট অসুবিধা ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ অশ্বারোহীরা দ্রুত আক্রমণ চালাতে গেলেই তাদের ঘোড়া আরোহীসহ গর্তে পড়ে যায়।

খন্দক ছিল আক্রা শহরের বাইরেও। ক্রুসেড বাহিনী সেই খন্দক পার হয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না। ওদিকে ময়দানে লাশের স্তুপ। সেই লাশের দুর্গন্ধে তাদের অবস্থাও কাহিল। কমান্ডাররা সৈন্যদের বললো, 'এই লাশগুলো তুলে নিয়ে খন্দকে ফেলে দাও।'

বিরাট রণাঙ্গন থেকে লাশগুলো কুড়িয়ে এনে সৈন্যরা সেই লাশ খন্দকে ফেলতে লাগলো। প্রশস্ত খন্দক ক্রুসেড বাহিনীর মৃত সৈন্য ও ঘোড়ার লাশে ভরাট হতে লাগলো।

লাশের গন্ধে ছুটে এলো শত শত শকুন। তারা খন্দকে বসেই সে সব লাশ খেতে লাগলো। এই শকুনের ঝাঁকের মধ্যেও প্রায় প্রতিদিনই একটা পায়রা আক্রা থেকে উড়ে সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্পে যায় আবার সেখান থেকে উড়ে আক্রাতে চলে আসে।

একদিন ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড তার তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সঙ্গে তার বোন জিয়ান ও বাগদত্তা রাণী বিরাঙ্গারিয়া।

তিনি লক্ষ্য করলেন, একটি পায়রা একা একা উড়ে যাচ্ছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে। তিনি জিয়ানকে বললেন, 'পায়রাটাকে লক্ষ্য করো।'

জিয়ান বললো, 'পায়রাটাকে আমি আগেও দেখেছি। সব সময় একাই উড়ে। কখনো ওর সাথে কোন সঙ্গী দেখিনি।'

রিচার্ড তার বোনকে বললেন, 'এরপর যখনই পাখীটাকে দেখতে পাবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাজপাখী লেলিয়ে দেবে ওর পিছনে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই কবুতর আমাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে।'

সম্রাট রিচার্ডের বয়স হয়েছে। তিনি তার যুবতী বোনকে সঙ্গে রেখেছেন তাকে রাজকার্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে। তার ইচ্ছা, বায়তুল মোকাদ্দাস জয় হয়ে গেলে দেশে ফিরেই তিনি তার বোনের বিয়ের দিকে মন দেবেন।

এই বোনটির জন্য তার বড়ই মায়া হয়। কিছুদিন আগে বোন জিয়ানকে তিনি সিসিলের সম্রাটের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল মন্দ বোনের, বিয়ের পরপরই সম্রাট মারা যান। বোন জিয়ান যৌবন কালেই বিধবা হয়ে ফিরে আসে ভাইয়ের কাছে।

সে এতই সুন্দরী ছিল যে, হাজার নারীর মধ্যেও তার রূপ ঝলমল করতো। মনে হতো, রাজকুমারী এখানে একজনই আছে, আর সেই রাজকুমারীর নাম জিয়ান।

জিয়ান সম্রাটের কথা শুনে হেসে দিল। জিয়ানের হাসি শুনে সম্রাট রিচার্ড তাকালেন তার দিকে, বললেন, 'হাসছো কেন?'

জিয়ান তাকে উল্টো প্রশ্ন করলো, 'ভাইয়া! এই কবুতরটি মারা গেলে-সেই সাথে সুলতান আইয়ুবীও কি মারা যাবেন?'

'এই কবুতরটি পত্রবাহক, পোষা পায়রা, জিয়ান!' রিচার্ড বললেন, 'এই পাখীর এক পায়ে একটি চিঠি বাঁধা আছে। আক্রা শহর থেকে চিঠিটা পাঠানো হচ্ছে সুলতান আইয়ুবীর কাছে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আবার চিঠি লিখে কবুতরটির পায়ে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দেবেন। এভাবেই সুলতানের সব খবর আক্রাবাসী এ চিঠির মাধ্যমে পেয়ে যায়। আক্রাবাসীদের মনে সাহস ও প্রেরণা জোগায় এ কবুতর। নইলে অবরুদ্ধ কয়েকটি লোক আমাদের বিশাল বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে এভাবে টিকে থাকতে পারতো না।'

'এত বিশাল বাহিনী থাকার পরও আপনারা শহরটি গুড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আমরা ওদের সাথে পারছি না। তুমি দেখতে পাচ্ছো, আমাদের পাথর বর্ষণের ফলে ওদের প্রাচীরের উপরের দিকের কয়েক স্থান ধ্বসে গেছে। আমাদের নিক্ষিপ্ত অগ্নিতে শহরটি প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারা অস্ত্র সমর্পন করছে না। এই সাহসের পেছনে আছে সামান্য এই কবুতর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কবুতরটি যদি সুলতানের সাথে তাদের যোগাযোগ না রাখতো তবে অনেক আগেই তারা আত্মসমর্পন করে ফেলতো।'

'আপনার আসল লক্ষ্য তো জেরুজালেম, যা এখনও বহু দূরে। আপনারা জেরুজালেম না গিয়ে এখানে বসে আছেন কেন?'

জিয়ান বললো, 'যদি আক্রা দখল করতেই কয়েক বছর লেগে যায় তবে কি আপনি আপনার জীবদ্দশায় জেরুজালেমের মুক্তি দেখে যেতে পারবেন?

আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, আক্রা শহরে মাত্র দশ হাজার সৈন্য আছে ওদের। এ কথা মুসলমান যুদ্ধবন্দীরাও স্বীকার করেছে। কিন্তু আমাদের সৈন্য সংখ্যা এখনও পাঁচ লাখের বেশী আছে।

অবরোধ ১১৮৯ সালের আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে শুরু হয়েছে, এখন ১১৯১ সালে আগষ্ট মাস। এর মধ্যে পার হয়ে গেছে দুইটি বছর। ভাইয়া! এই দুই বছরেও যখন তোমরা ছয় লাখ সৈন্য নিয়ে মাত্র দশ হাজার অবরুদ্ধ সৈন্যকে পরাজিত করতে পারোনি তখন তোমরা তাদের আদৌ পরাজিত করতে পারবে কি না এ প্রশ্ন কি এসে যায় না?

তোমরা দুই বছরে আক্রার দুর্গ প্রাচীরের সামান্য ক্ষতিসাধন ও মেঞ্জানিক দিয়ে শহরের কিছু অংশে আগুন লাগানো ছাড়া আর কোন সফলতা লাভ করতে পারোনি। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমরা এ শহরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারবে না।'

সম্রাট রিচার্ড রাণীকে বললেন, 'তুমি একটু তাবুতে যাও।' বিরাঙ্গারিয়া সেখান থেকে চলে গেলেন।

রাণী চলে যাওয়ার পর রিচার্ড তার বোন জিয়ানকে বললেন, 'মহান ক্রুশ ও পবিত্র জেরুজালেমের শপথ, এর সম্মানের জন্য আমি আমার জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। আমি মনে করি

প্রতিটি খৃস্টানেরই এমন মনোভাব থাকা দরকার।

জিয়ান, আজ থেকে তুমি ভুলে যাও, তুমি আমার বোন। তুমি মনে করো, তুমি এই ক্রুশের এক কন্যা। তুমি জানো, আমাদের পবিত্র ক্রুশটি এখন মুসলমানদের হাতে।

আর তুমি এটাও জানো, পবিত্র জেরুজালেম, যেটা আমাদের পয়গম্বরের তীর্থ স্থান, সেটাও এখন মুসলমানদের অধিকারে। তুমি জানো, আক্রা দখল করা আমাদের মূল টার্গেট নয়। আমাদের মূল টার্গেট এখন ইসলাম তথা মুসলিম জাতিকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করা।

জিয়ান! তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো, মুসলমানরা কি মরণপণ যুদ্ধ করছে। এরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। এই যে অল্প ক'জন মুসলমান, এরাও জয়লাভের আশা নিয়েই যুদ্ধ করছে।

আমি এখানে এই প্রথমবার এসেছি এবং তাদের যুদ্ধ করা দেখতে পাচ্ছি। তাদের আবেগ ও প্রেরণার এই উন্মাদনার কথা গল্পে শুনেছি, এখন তা সচক্ষে দেখতে পেলাম।

তবে আমি শুনেছি, মুসলমানদের শুধু মেয়েরাই কব্জা করতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তার পিছনে আমাদের মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লোভ, সম্পদের মোহ, মদ ও নারীর নেশা মুসলমানদের মধ্যে আমাদের মেয়েরাই চালু করেছে।'

'কিন্তু তারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে কব্জা করতে পারলো না কেন?' প্রশ্ন করলো জিয়ান।

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এক ঈমানদার সাচ্চা মুসলমান।

যতোক্ষণ মুসলমানরা তাদের ঈমানকে মজবুত রাখতে পারে ততোক্ষণ তাদের কিছুতেই কাবু করা যায় না। সে ঈমানদার বলেই তাকে আমরা তার লক্ষ্য বিচ্যুত করতে পারিনি।

তিনি তার মুসলমান ভাই, যাদের আমরা নানাভাবে লোভ দেখিয়ে হাতে করেছিলাম, তলোয়ারের জোরে তিনি তাদেরকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। তিনি তাদের প্রাণে আবার ইসলামী প্রেরণা ও জোশ জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।'

জিয়ান বললো, 'আমিও সেই সব মেয়েদের ত্যাগের কথা শুনেছি। তারা মুসলমান শাসনকর্তা ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের বশ করে ইসলামের বহু ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। তারা সেখানে গোয়েন্দাগিরী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। যদি তারা সফল হতো তবে আমাদের আজ নতুন করে লড়াইতে নামতে হতো না।'

'আমি একে ব্যর্থও বলতে পারি না।' সম্রাট রিচার্ড বললেন, 'যদি মুসলমানদের জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করার কাজে আমরা মেয়েদের ব্যবহার না করতাম তবে মুসলমানরা বহু আগেই শুধু ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম নয় বরং অর্ধ ইউরোপ অধিকার করে ফেলতো।

আমরা নারীর রূপের মোহ ও আকর্ষণে অধিকাংশ মুসলিম আমীর, উজির ও সেনাপতিদের ফেলতে পেরেছিলাম বলেই তারা সম্রাট হওয়ার লোভে নিজেদের জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল।

জিয়ান, একবার ভেবে দেখো, তারা নিজেদের সামরিক শক্তি

নিজেদের ওপর ব্যবহার না করে যদি আমাদের ওপর করতো তাহলে কি অবস্থা হতো আমাদের?

তাদের নিঃশেষ হওয়া শক্তির সাথেই আমরা পেরে উঠছি না, যদি সমগ্র জাতিকে এক করে তারা আমাদের বিরুদ্ধে একবার দাঁড়াতে পারতো তবে যিশুর সন্তানরা মাথাগোঁজার মত একটু ঠাঁইও পেতো না দুনিয়ার কোথাও। তাই আমাদের মেয়েদের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা তুমি বলতে পারো না।'

'আপনি এসব কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?' জিয়ান বললো, 'আপনার কথায় নিরাশার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

'আমি তো তোমাকে শুরুতেই বলেছি, তুমি যে আমার বোন সে কথা ভুলে যাও। তুমি এখন ক্রুশের কন্যা। এই ক্রুসেড যুদ্ধে তোমাকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আমার বিশ্বাস তুমি তা পারবে।

তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদের সাথে অপোসের আলোচনাও চলছে। আমরা একে অপরের সাথে দুত বিনিময় করে চলেছি। আমার সাথে দেখা করার জন্য সুলতান আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিন এসেছিলেন। আমি তাঁকে আমাদের শর্তগুলো মেনে নিতে বলেছি।

কিন্তু তিনি তা মানতে প্রস্তুত নন। আমি তাকে বললাম, 'তোমরা জেরুজালেম ও মহান ক্রুশটি আমাদের দিয়ে দাও, আর যে সব এলাকায় খৃস্টান শাসন ছিল সে এলাকা ছেড়ে চলে

যাও, আমরা ফিরে যাবো। আমরা কোন মুসলমান দেশ দখল করতে এখানে আসিনি। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী এর একটি শর্তও মানতে রাজী হচ্ছেন না।'

'আপনি নিজেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সঙ্গে দেখা করছেন না কেন?'

'তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না।' সম্রাট রিচার্ড বললেন, 'তিনি এখন অসুস্থ! মনে হয় তার ভাই তকিউদ্দিনই সালাহউদ্দিনের নামে সব কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। আমি তার মধ্যে একটি দুর্বলতা দেখেছি। সে সুন্দর ও সুপুরুষ। তাকে আমার মনে হয়েছে প্রফুল্ল মনের এক সজীব মানুষ। আমি এই লোকটাকে আমার নিয়ন্ত্রণে আনতে চাই। আমি তাকে আমার বন্ধু ও আত্মীয় বানাতে চাই। কিন্তু এ কাজ তো তোমার, আমি কেমন করে সেটার সমাধা করবো?'

'আপনি কি সেই ছলনার কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছেন যে কাজ আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেনিংপ্রাপ্ত মেয়েরা করতো?'

'হ্যাঁ!' রিচার্ড বললেন, 'তাকে তুমি জয় করো, ভালবাসার অভিনয়ে বন্দী করো তাকে। বলো, তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও। আমি তোমাদের সব রকম সাহায্য ও মধ্যস্থতা করবো। আমি তখন সালাহউদ্দিনকে বলবো, 'আপনি সাগর উপকূলের রাজ্যগুলো আপনার ভাই ও আমার বোনকে ছেড়ে দিন। আমি উভয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।'

তুমি তকিউদ্দিনকে বুঝাও, সে যেন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। যদি তাতে রাজি না হয় তাতেও আপত্তি নেই। তাকে বলো, সে তোমাকে গ্রহণ করলে চিরদিনের মত খৃস্টান ও মুসলমানদের দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যাবে। সে উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর বাদশাহ হলে কোন খৃস্টান সম্রাট আর তা দখল করতে আসবে না। আমি আশা করি তুমি তাকে সুলতান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারবে।'

জিয়ান কিছুক্ষণ নিরব থাকলো। সম্রাট রিচার্ড গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। জিয়ান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ না তুলেই বললো, 'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখবো।'

'মুসলমানদের এমনি ছলনা দিয়েই মারতে হয়।' রিচার্ড বললেন, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এদের পরাজিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। কিন্তু সে চেষ্টা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। হয়তো সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচেই থাকবো না। আমাকে শিঘ্রই ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার অবস্থাও বেশী ভাল নয়। বিরোধী চক্র আমার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করছে।'

যে কবুতরটি রিচার্ডের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল সেটি সুলতান সালাহউদ্দিনের তাবুর ওপর গিয়ে বসলো। এক রক্ষী দৌড়ে গিয়ে কবুতরের পায়ে বাঁধা চিঠি খুলে সুলতানের তাবুর মধ্যে নিয়ে গেল।

সুলতান আইয়ুবী তখন অসুস্থতার কারণে খুবই দুর্বল অনুভব করছিলেন। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন তিনি। চিঠি এসেছে

শুনেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন। চিঠিটি রক্ষীর হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

আক্রা শহরের সৈন্যদের সাথে সুলতানের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এই পত্রবাহক কবুতর। চিঠি পাঠিয়েছেন আক্রা শহরের দু'জন সেনাপতি আল মাশ্‌তুত ও বাহাউদ্দিন কারাকুশ। এই দু'জনই অসাধারণ সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন।

তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন অবরোধে থেকে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শত্রু সেনারা কান পেতে আছে কখন আক্রার সেনাদল অস্ত্র সমর্পন করবে এই ঘোষণা শোনার জন্য। তবে তারা জানিয়ে দিয়েছে, মুসলমান সৈন্যরা কোনদিন অস্ত্র সমর্পনের ট্রেনিংই পায়নি।

এই চিঠিতে মাশতুত ও কারাকুশ সুলতান আইয়ুবীকে আবারও জানিয়েছেন, যা তারা ইতিপূর্বে বহুবার সুলতানকে জানিয়েছেন, 'আপনি এমন আশা করবেন না যে, আমরা জীবিত অবস্থায় আত্মসমর্পন করবো।

তারা লিখেছে, 'আপনি আপনার সঙ্গের সৈন্যদের বলবেন, তারা যেন খৃস্টান বাহিনীর পশ্চাৎ দিক থেকে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সব সময় তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখে। সৈন্যদের আরো বলবেন, আমরা শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি, তারাও ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গী হতে পারে।

খৃস্টানদের আক্রমণে আক্রা শহর অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। আমাদের দশ হাজার সৈন্যের অর্ধেক এরই মধ্যে শাহাদাতের

পেয়ালা পান করে চলে গেছে আল্লাহর দরবারে। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার মুজাহিদ পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ভয়শূন্য হৃদয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিঃশেষ করার আগে কোন বেদ্বীন ও কাফের এ শহরে ঢুকতে পারবে না।

আপনি শহরবাসীর চেতনা ও আবেগের কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। তারা দিনে এক বেলা আহার করে আর দুই বেলার আহার সৈন্যদের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমাদের মেয়েরাও আমাদের সহযোগিতা করছে সর্বোতভাবে। তারা প্রত্যেকেই ঘরের পাশের ফাঁকা জায়গায় সবজির চাষ করছে যেন আমাদের দান করতে পারে। পুরুষের মত মেয়েরাও এখন এক বেলা খাবার গ্রহণ করছে।'

চিঠিতে প্রাচীরের অবস্থাও লিখেছেন তারা। লিখেছেন, 'খৃস্টান সৈন্যরা মেঞ্জানিক দিয়ে ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করে শহরের প্রাচীরের কয়েক স্থান ভেঙ্গে ফেলেছে। তবে প্রাচীরের উপরের অংশই নষ্ট হয়েছে তাতে, নিচের অংশ এখনো অটুট আছে। গম্বুজ ধ্বসে পড়েছে।

শত্রুরা শহরের বাইরের খন্দকের কয়েকটি স্থান তাদের সৈন্যদের লাশ দিয়ে ভরাট করে ফেলেছে। এই ভরাট করার কাজে তারা মৃত সৈন্য এবং মৃত ঘোড়া ব্যবহার করেছে। তার ওপর মাটি দিয়ে তারা চলাচলের মত রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে পথে যখনই শত্রু সৈন্য প্রাচীরের কাছে আসতে চেষ্টা করেছে, আমরা তাদের পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

যুদ্ধের ব্যাপারে এখন আমাদের আরও নতুন নতুন পদ্ধতি

উদ্ভাবন করা দরকার। আপনি যখন ঢোলের শব্দ শুনবেন তখন শত্রুর ওপর পিছন থেকে প্রবল বেগে আক্রমণ করবেন। আমরা তখনই ঢোল বাজাতে আরম্ভ করবো যখন ক্রুসেড বাহিনী প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালাবে।

অথবা আমরা শত্রুর ওপর আক্রমণ করার আগেও ঢোল বাজাতে পারি যাতে তখন আপনারাও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। দুই দলের মাঝে ফেলে আমরা তাদের পিষে মারতে থাকবো যতোক্ষণ তাদের অস্তিত্ব থাকে বা আমরা নিঃশেষ হয়ে না যাই।

আমরা আরো চিন্তা করছি, রাতে গোপনে শহর থেকে বের হয়ে আমরা তাদের জাহাজে চড়াও হবো এবং পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবো। আপনি আমাদের এ পরিকল্পনা অনুমোদন করলে জানাবেন।'

সুলতান আইয়ুবী দুর্বল শরীর ও জ্বরের বেগ নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কাতেবকে ডেকে চিঠির উত্তর লিখতে বসলেন। সুলতান তাবুর ভেতর পায়চারী করতে করতে বলে যাচ্ছিলেন, কাতিব সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নিচ্ছিল।

চিঠি লেখা শেষ হলে তিনি কাতেবকে বললেন, 'পুনশ্চ দিয়ে আরো লিখ, 'তোমাদের জন্য সামান্য সংখ্যক জানবাজ কমান্ডো সৈন্য পাঠালাম। কোন খাদ্য সামগ্রী তাদের দেইনি নিতে অসুবিধা হবে বলে।

তারা রাতে সাগর পথে শহরের উপকূলে পৌঁছবে। না, কোন জাহাজে চড়ে যাবে না ওরা, ওরা যাবে সাঁতরে। তোমরা ওদের

শহরে ঢুকার পথ করে দেবে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা! এখন তোমাদের একমাত্র আল্লাহই সহায়। ইসলামের উপর এখন কঠিন সমস্যা চেপে আছে। এটা আমারই দোষ। আমিই ক্রুসেড বাহিনী আক্রাতে ডেকে এনেছিলাম বায়তুল মোকাদ্দাসকে বাঁচানোর জন্য।

আমার ইচ্ছে ছিল, শত্রুদের আমরা এখানেই ব্যস্ত রাখবো যাতে ধীরে ধীরে তাদের শক্তি ও সাহস কমতে থাকে। শত্রুদের সমস্ত শক্তি এখানে শেষ করে দিতে পারলে তারা আর বায়তুল মোকাদ্দাসে অভিযান চালাতে পারবে না।

অতএব তোমরা মনে রাখবে, তোমরা আক্রা শহর বাঁচানোর জন্য লড়াই করছো না, বরং তোমরা জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করছো মসজিদুল আকসা ও বায়তুল মোকাদ্দাস রক্ষার জন্য।'

এই চিঠি কবুতরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের ডাকলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'এখন প্রত্যেক কমান্ডার ও সেনাপতির কাছে গিয়ে নির্দেশ দেয়ার শক্তি ও সময় আমার নেই। আমার শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে তা আমি জিহাদে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যয় করতে চাই। তোমরা তোমাদের সৈন্যদের বলো, তারা যেন আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও তার মাধ্যমে আমরা যে দ্বীন পেয়েছি সেই দ্বীনের জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করে।

আমি যদি তাদের নির্দেশ দিতে নাও পারি, জিহাদের জন্য আল্লাহ কোরআনে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশের কথা

স্মরণ করে ওরা যেন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। একথা যেন কেউ চিন্তা না করে, তারা সুলতান আইয়ুবীর আদেশে ও তার জন্য লড়ছে।

তোমাদের এ কথা আমি এ জন্যই বললাম, এমন সময়ও আসতে পারে, যখন সৈন্যদের নির্দেশ দেয়ার জন্য তোমরা আর বেঁচে থাকবে না। আমি জানি, আমার মতোই তোমরাও তোমাদের জীবন আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছো। এই জীবনের মূল্য আল্লাহ কি দেবেন তা তিনিই ভাল জানেন। এ নিয়ে কোন চিন্তা করার সময় এখন আমাদের হাতে নেই।'

সুলতান আইয়ুবীর এ ভাষণ ছিল যেমন আবেগদীপ্ত তেমনি উদ্দীপনাময়। তাঁর আবেগ এমন অবস্থায় ছিল, মা তার শিশুকে হারিয়ে ফেললে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় অনেকটা সে রকম।

সুলতান আইয়ুবীর উপদেষ্টা কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ সময় আমি সুলতান আইয়ুবীকে অনেকবার বলেছি, সুলতান, তোমার শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দাও। তুমি তোমার দেহটাকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে পারো না। আল্লাহকে স্মরণ করো, জয় পরাজয় তো তাঁরই হাতে।'

সুলতানের চোখে তখন অশ্রু বয়ে যেতো। তিনি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলতেন, 'বাহাউদ্দিন! আমি বায়তুল মোকাদ্দাস ও মসজিদুল আকসা খৃষ্টানদের দ্বারা কলংকিত হতে দেবো না। আমি সে পবিত্র স্থান অপবিত্র হতে দেবো না, যেখান থেকে আমাদের প্রিয় নবী আল্লাহর দরবারে গিয়েছিলেন।

যে মসজিদে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়েছিলেন আমরা বেঁচে থাকতে সেই ঘর আবার নাপাক করবে নাসারারা? না বাহাউদ্দিন, তা হতে পারে না। আমি মরে গেলেও বায়তুল মোকাদ্দাস খৃষ্টানদের হাতে তুলে দেবো না।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ আরও বলেছেন, 'এক রাতে তিনি এতই অস্থির ছিলেন যে, সে রাতে আমি তার কাছেই থাকতে বাধ্য হই। তার চোখে কোন ঘুম ছিল না। আমি আল কোরআনের কয়েকটি সূরা পাঠ করলাম। তাকে বললাম, 'সালাহউদ্দিন, এগুলো তুমিও পড়তে থাকো।'

তিনি চোখ বন্ধ করে নিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর ঠোঁট নড়ছে। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ইয়াকুবের কোন সংবাদ এলো না? সে কি শহরে প্রবেশ করতে পারবে?'

এভাবে আল্লাহর কালাম পড়তে পড়তে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমোনোর কয়েক মিনিট পর ছটফট করতে করতে আবার তিনি জেগে উঠলেন। আবার ঘুমোলেন। আবার জেগে উঠলেন।

সুলতান আইয়ুবীর তাবু থেকে আক্রার প্রাচীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শহরের বাইরে ক্রুসেড বাহিনীর সমাবেশকে মনে হচ্ছিল মৃত পোকা-মাকড়ের ওপর এক দঙ্গল ডাসা পিঁপড়ে বসে আছে। পোকাটাকে ঢেকে ফেলেছে পিঁপড়ের ঝাঁক।

রাতে আক্রার প্রাচীরের উপর মশালের চলাফেরা লক্ষ্য করছিল আইয়ুবীর সঙ্গের সৈন্যরা। দেখছিল কিভাবে খৃস্টানদের নিক্ষেপ

করা আগুনের গোলাগুলো প্রাচীরের উপর দিয়ে ভেতরে গিয়ে পড়ছে। প্রাচীর থেকেও গোলা ছুটে আসছে বাইরে খৃস্টান বাহিনীর ওপর। সুলতান আইয়ুবী তার কমান্ডোদের বললেন, 'যাও, আক্রমণ চালাও।'

কমান্ডো বাহিনী ছুটে গেল শত্রুর দিকে। তীব্র আঘাত হানলো খৃস্টান বাহিনীর ওপর। আক্রার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল রক্তাক্ত লাশের স্তুপ। আহতদের চিৎকারে ভারী হয়ে উঠছিল রাতের আকাশ।

ঘুমের মধ্যে সুলতান আইয়ুবী বার বার ইয়াকুব, ইয়াকুব বলে নৌবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনকে ডাকছিলেন।

ইয়াকুব নৌবাহিনীর এক সাহসী ক্যাপ্টেন। তার নেতৃত্বেই আক্রা শহরে একদল কমান্ডোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সমুদ্র উপকূল ঘেরাও করে রেখেছিল খৃস্টান বাহিনী। সেই বাহিনীর চোখ এড়িয়ে তাদের পৌঁছতে হবে শহরে।

শহরের তিন দিকই ছিল সমুদ্রবেষ্টিত। বিশাল সমুদ্র উপকূল জুড়ে নোঙর করা ছিল ক্রুসেড বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলো। এদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শহরে অস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী পাঠানো ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সুলতান আইয়ুবী ক্যাপ্টেন ইয়াকুবকে বললেন, 'শহরে খাদ্য ও অস্ত্র পাঠানো দরকার।'

ইয়াকুব বললো, 'আপনি অনুমতি দিলে এ দায়িত্ব আমি নিতে পারি।' এভাবে ক্যাপ্টেন ইয়াকুব নিজেই এক কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

ক্যাপ্টেন ইয়াকুব ছিলেন হলবের অধিবাসী। চাকরী জীবনের শুরুতে যোগ দিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবীর স্থল বাহিনীতে। সেখান থেকে তাকে নেয়া হয় কমান্ডো দলে। কমান্ডো ট্রেনিং শেষে তাকে নৌহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়।

তার সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয়শো পঁচিশ। ওখান থেকে চারশো সৈন্য তিনি রাতের আঁধারে আক্রায় পাঠিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট দুইশো পঁচিশ জন সৈন্য নিয়ে ইয়াকুব বৈরুতে চলে গেলেন। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য বোঝাই করলেন।

জাহাজে খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্র বোঝাই করে তিনি আবার আক্রার পথ ধরলেন। তিনি জাহাজে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী তুলেছিলেন যা দিয়ে আক্রাবাসী দীর্ঘ দিন খেয়ে পরে যুদ্ধ করতে পারবে।

ইয়াকুব তার সৈন্যদের বললেন, 'আমাদের জান চলে যেতে পারে কিন্তু এ রসদপত্র আক্রা পৌঁছাতেই হবে। ক্রুসেড বাহিনী আমাদের উপকূলে ভিড়তে দেবে না।

উপকূলের কয়েক মাইল দূরে জাহাজ নোঙর করা হবে। সেখান থেকে রাতের আঁধারে নৌকা নিয়ে তোমরা চলে যাবে। আক্রা পৌঁছতে পারলে মাল খালাস করে আবার ফিরে আসবে। এভাবেই সব মাল আমাদের খালাস করতে হবে।'

১১৯১ সালের ৮ জুন। ইয়াকুবের জাহাজ আক্রা থেকে তখনো কয়েক মাইল দূরে। ক্রুসেড বাহিনীর চল্লিশটি যুদ্ধ জাহাজ ইয়াকুবের জাহাজকে ঘিরে ফেললো।

ইয়াকুব জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'জাহাজ আক্রার দিকে চলতে থাকবে। ওরা বাঁধা দিলে যুদ্ধ হবে। কিন্তু জাহাজের

গতি কমাবে না।'

ক্রুসেড বাহিনী তাদের থামতে বললো। কিন্তু জাহাজ তো থামলোই না, উপরন্তু ইয়াকুবের সৈন্যরা ক্রুসেড বাহিনীর দিকে তাক করে কামানের গোলা ছুঁড়তে লাগলো।

চল্লিশটি জাহাজ একযোগে আক্রমণ করলো তাদের। তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করলো। যুদ্ধ চলছিল, জাহাজও আক্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

ইয়াকুবের জানবাজ সৈন্যরা ক্রুসেড নৌবহরের প্রচুর ক্ষতিসাধন করলো। চারটি জাহাজ ডুবে গেল ক্রুসেড বাহিনীর। ইয়াকুবের জাহাজ তখনো ছুটছে উপকূলের দিকে। কিন্তু তার গতি পড়ে গেছে। খৃস্টানদের গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে জাহাজের পাল।

ফরাসী ঐতিহাসিক ডিভেনসুফ লিখেছেন, 'তারা যখন যুদ্ধ করছিল তখন মনে হচ্ছিল, তারা কেউ মানুষ নয়। ভূতের মতো তারা লড়ছে এবং অকাতরের প্রাণ দিচ্ছে।'

কিন্তু তারা ঘেরাও থেকে বের হতে পারলো না। ইয়াকুবের অর্ধেক সেনা তীর ও গোলার আঘাতে মারা গেলো। আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় লড়তে লাগলো বাকী সৈন্যরা।

ইয়াকুব যখন দেখলো, জাহাজের পাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় জাহাজের গতি থেমে গেছে এবং খৃস্টান নৌবাহিনীর সৈন্যরা তীর খেয়েও ছুটে আসছে জাহাজের দিকে তখন তার বুঝতে বাকী থাকলো না, অচিরেই খৃস্টান সৈন্যরা জাহাজে উঠে আসবে এবং দখল করে নেবে জাহাজ।

তখন ইয়াকুব তার জানবাজদের ডেকে বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা সম্মানের সাথে মরবো। শত্রুরা এ জাহাজ দখল করতে ছুটে আসছে। কিন্তু এর খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র আমরা শত্রুদের হাতে তুলে দিতে পারি না। তোমরা হাতিয়ার ফেলে হাতে কুড়াল তুলে নাও। জাহাজে কুড়াল মেরে ডুবিয়ে দাও এ জাহাজ। জাহাজের মধ্যে পানি ঢুকলে সহজেই এটা ডুবে যাবে। তখন আর ক্রুসেড বাহিনী আমাদের মাল সামান হস্তগত করতে পারবে না।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা যায়, যেসব সৈন্যরা জীবিত ছিল তারা পাটাতনের নিচে গিয়ে জাহাজ ভাঙ্গা শুরু করলো। জাহাজের তল ছিদ্র হলে সাগরের পানি জাহাজে প্রবেশ করতে শুরু করে। কোন সৈন্যই জাহাজ থেকে বেরিয়ে সাঁতরে বাঁচার চেষ্টা করেনি, সকলেই জাহাজের সাথে সমুদ্র তলে ডুবে গেল।

সুলতান আইয়ুবী যখন এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনলেন তখন তিনি তাবু থেকে বের হলেন। তার ঘোড়া সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তিনি লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হুকুম দিলেন, 'জলদি দফ ও নাকাড়া বাজাও।'

সঙ্গে সঙ্গে দফ ও নাকাড়া বেজে উঠলো। এটা আক্রমণের সংকেত। কিছুক্ষণের মধ্যে তার সৈন্যরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে মাঠে এসে সমবেত হলো। সুলতান আইয়ুবী সমবেত সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'মুজাহিদ ভাইসব!

আজ শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে আক্রার প্রাচীরের কাছে পৌঁছাতে হবে তোমাদের।'

প্রথমেই ঘোড়া ছুটালেন তিনি। তার পিছনে ছুটলো অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের পিছনে তীরন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা ছুটলো লড়াকুর বেশে। তীব্র বেগে তারা যখন ছুটে গেল বিশাল ক্রুসেড বাহিনীর কাছে, ওরা ভয়ে প্রথমে পিছিয়ে গেল কয়েক কদম।

কিন্তু ততোক্ষণে মুজাহিদ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর। বাধ্য হয়ে রুখে দাঁড়াতে হলো ওদের।

দৃশ্যতঃ এ আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছিল, মুজাহিদরা এলোপাথাড়ি আঘাত হানছে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী এভাবেই আঘাত হানার জন্য গত দু'দিন তার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তারা পরিকল্পিতভাবেই ক্রুসেড বাহিনী ওপর এলোপাথাড়ি আঘাত হেনে যাচ্ছিল।

মুসলমানদের এমন ক্ষিপ্ত আক্রমণ দেখে ক্রুসেড বাহিনীর কমান্ডার তার তীরন্দাজদের হুকুম দিল, 'দূর থেকে ওদের নিশানা করো। ওদের সামনে পড়ে আমাদের সৈন্যরা কচু কাটা হয়ে যাচ্ছে।'

ক্রুসেড তীরন্দাজরা ধনুকে তীর জুড়লো। নিশানা করলো ক্ষিপ্ত মুসলিম সৈন্যদের। প্রাথমিক ধাক্কার হতবিহবলতা কাটিয়ে উঠে তাদের পদাতিক বাহিনীও প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেল। তারও একটু পর প্রস্তুত হয়ে ময়দানে এলো ক্রুসেড বাহিনীর অশ্বারোহীদল।

তীরন্দাজ বাহিনী তীর বর্ষণ করছিল। কিন্তু তাতে মোটেই ভড়কালো না মুসলিম বাহিনী। তারা তাদের গতি অব্যাহত রেখেই সামনে এগিয়ে গেল।

এ আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলতান আইয়ুবী নিজে। তাকে বেষ্টন করে এগিয়ে যাচ্ছিল মামলুক সেনাদল। তারা এগুচ্ছিল বিদ্যুৎ গতিতে। ক্রুসেড তীরন্দাজরা নিশানা ঠিক করার সুযোগ পাচ্ছিল না। তারাও এলোপাথাড়ি তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলো।

ময়দানে ক্রুসেডদের সংখ্যা ছিল বেশুমার। হামলাকারী সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছিল, মুসলিম বাহিনী আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছে। অশ্বারোহীরা ছুটছিল এঁকেবেঁকে, যাতে তীরন্দাজদের তীর তাদের গায়ে না লাগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ এক সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করলো। খৃস্টান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো মুজাহিদদের বেপরোয়া আঘাতে। তারা এমনভাবে ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো যে, তাদের দেখাই যাচ্ছিল না। ময়দানে শুধু খৃস্টান বাহিনীই দেখা যাচ্ছিল। এমন বেপরোয়া আক্রমণে যেন কেয়ামত নেমে এলো। ক্রুসেড বাহিনী প্রবল শক্তিতে মুসলমানদের আঘাত প্রতিহত করতে লাগলো।

এ যুদ্ধ তখনই শেষ হলো যখন সন্ধ্যার আঁধারে ছেয়ে গেল পৃথিবী। খৃস্টানদের বহু সৈন্য হতাহত হলো। ময়দানে পড়ে রইলো অসংখ্য লাশ ও আহত সৈনিক।

কিন্তু এত কিছুর পরও মুসলিম বাহিনী কাঙ্খিত সফলতা লাভ

করতে পারলো না। যে প্ল্যানে সুলতান আইয়ুবী আক্রমণ চালিয়েছিলেন সে পরিকল্পনা সফল হলো না তার। তিনি আক্রার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না।

এমন আক্রমণ এটাই প্রথম ও শেষ নয়। আক্রার অবরোধের দু'বছর কেটে গেল। এই দু'বছরের মধ্যে সুলতান আইয়ুবী পিছন থেকে এমন আকস্মিক ও বেপরোয়া আক্রমণ বহুবার চালিয়েছেন। প্রত্যেক আক্রমণেই জানবাজ সৈন্যরা বীরত্বের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ইতিমধ্যে সুলতান আইয়ুবীর সাহায্য এসে গেলো মিশর থেকে। হলব এবং হারানের আমীরদের দেয়া সৈন্য ও রসদ সাহায্যও পাওয়া গেল সামান্য পরিমাণে। ছুটিতে যাওয়া সৈন্যরাও নিজ নিজ ক্যাম্পে গিয়ে কাজে যোগ দিল। তাদের একটা অংশও শামিল হলো সুলতানের সাথে। যুদ্ধও চলতে লাগলো তীব্র থেকে তীব্রতর।

বিশাল বাহিনী আর প্রচুর লড়াইয়ের পরও ক্রুসেড বাহিনী আক্রা শহরে প্রবেশ করতে পারলো না। অবরোধ করতে এসে তারা নিজেরাই এখন অবরোধের মধ্যে পড়ে গেল।

এভাবে দীর্ঘ দিন কেটে গেলে খৃস্টান সৈন্যদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল। কারণ প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা অল্প অল্প করে কমছিল। তাদের মনে হলো, এভাবে চলতে থাকলে তারা কেউ জীবিত দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তার আগেই কোন একদিন সেও ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। তখন তার সাথীরা সেই লাশ কোন খন্দকে ফেলে দিয়ে ভরাট করবে

খন্দক। তারপর সেখানে মাটি ফেলে তার ওপর দিয়ে তারা তৈরী করে নেবে তাদের চলাচলের পথ।

ক্রুসেড বাহিনীর সংখ্যা যেমন ছিল অপরিমেয়, তেমনি তাদের লাশের সংখ্যাও ছিল অগুণতি। এত বেশী লাশের সংখ্যা দেখে সাহসী খৃস্টান সৈন্যদের মনোবল ক্রমেই আরো কমতে লাগলো। একদিন দেখা গেল, তাদের সাহস কমতে কমতে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এমনকি সম্রাট রিচার্ডের মনেও আতংক দেখা দিল।

মুসলিম সৈন্যদের মনোবল প্রবল বাঁধার মুখেও শুরুতে যেমন ছিল তেমনি অটুট রইলো। কারণ তাদের মনে একই সাথে দু'টো প্রাপ্তির স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল, এর যে কোন একটি পেলেই তারা খুশী। আর সে স্বপ্ন দুটো ছিল, বিজয় অথবা শাহাদাত।

এ সময় সম্রাট রিচার্ড সুলতান আইয়ুবীর কাছে সন্ধির দুত বিনিময় শুরু করেন। রিচার্ডের দুত আসতো সুলতান তকিউদ্দিনের কাছে। তকিউদ্দিন সন্ধির শর্তাবলী ও প্রস্তাব সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে দিতেন।

রিচার্ডের দাবী ছিল দুটো, বায়তুল মোকাদ্দাস, যাকে তারা জেরুজালেম বলে সেটা তাদের কাছে হস্তান্তর করা আর হাতিনের যুদ্ধের ময়দান থেকে পাওয়া পবিত্র ক্রুশটি তাদেরকে ফেরত দান। প্রথম দিকে দাবী ছিল তিনটি। অপর দাবীটি ছিল, এ যাবত সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের কাছ থেকে যে সব এলাকা দখল করেছেন তা ফেরত দেয়া। এখন এ দাবীটি তিনি ছাড় দিতে সম্মত হয়েছেন।

সুলতান আইয়ুবী জেরুজালেমের নাম শুনলেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তবুও তিনি সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যেতে তকিউদ্দিনকে পরামর্শ দেন। তাকে বলেন, 'তুমি সম্রাট রিচার্ডের সাথে কথা চালিয়ে যাও।'

প্রায় সব ঐতিহাসিক একমত যে, সম্রাট রিচার্ড ও তকিউদ্দিন এই আলোচনা চালাতে গিয়ে একে অন্যের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তকিউদ্দিন যখন সম্রাট রিচার্ডের কাছে যেতেন তখন তার বোন জিয়ানও তাদের কাছে থাকতো। এতো বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তকিউদ্দিন সম্রাট রিচার্ডের শর্ত মেনে নিতে পারছিলেন না। এই মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাতের মধ্যেও আক্রার যুদ্ধ সমান তালেই চলছিল। রক্তারক্তি আরও তীব্রতর হচ্ছিল। আক্রার অবরুদ্ধবাসীদের অবস্থা আরও করুণ ও শোচনীয় হয়ে উঠছিল। ইউরোপীয় সম্রাটদের মধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড এরা দু'জনই ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করছিলেন।

'ভাইজান!' জিয়ান তার ভাই রিচার্ডকে বললো, 'আমি কিন্তু সফলতা লাভ করতে যাচ্ছি। সুলতান তকিউদ্দিন আমার ভালবাসা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি তার মধ্যে সেই দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছি না, যে দুর্বলতার কথা আপনি মুসলমান আমীর ও নেতাদের সম্পর্কে বলে থাকেন। সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে কিন্তু তার ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। সে বরং আমাকেই আমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার রূপের যাদুতে তাকে বশ করতে পারোনি, যেমনটি পারে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা।'
রিচার্ড বললেন, 'তকিউদ্দিন এখনো ঈমানের বলে যথেষ্ট বলিয়ান। আমি নিজেই তার সাক্ষী। আমি তাকে বলে দিয়েছি, 'তুমি যদি জিয়ানকে বিয়ে করতে চাও তবে তোমাকে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আর তোমার ভাইয়ের কাছে দাবী জানাতে হবে, তারা যেন উপকূলীয় রাজ্যগুলো তোমাকে দিয়ে দেয়। ওখানে কেবল তোমাদের দু'জনের শাসন চলবে।'
রিচার্ড বললেন, 'সে তার উত্তরে বললো কি জানো?' সে বললো, 'যদি ধর্মই ত্যাগ করতে হয় তবে এত রক্তক্ষয়ের কি প্রয়োজন ছিল?'
আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, 'তুমি কি আমার বোনকে ভালবাসো, পছন্দ করো?' সে উত্তরে বললো কি জানো? সে বললো, 'সে কথা তোমার বোনকেই জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে ততটুকু ভালবাসি সে যতখানি আমাকে ভালবাসে, তার বেশীও নয় কমও নয়।'
আমি তাকে বলেছি, 'তার সাথে মেলামেশা ও ভালবাসাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাদের ভালবাসা যদি তোমাদের মনকে এক সূত্রে বাঁধতে না পারে তবে সেখানে আমি বিয়েতে রাজি হই কি করে? আগে তোমরা এ ব্যাপারে একমত হও।'
রিচার্ড তার বোনকে বললো, 'জিয়ান! শিকার জালে আটকা

পড়েছে। কিন্তু এই কৃতিত্ব তুমি তখনই দাবী করতে পারবে, যখন জাল গুটিয়ে তাকে উপরে তুলতে পারবে। তবে জাল গুটানোর সময় তুমি আয়নায় তোমার চেহারা দেখে নিও।'

'সে কথা আমার স্মরণ আছে, ভাইজান।' জিয়ান প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'ভাইজান! একটা খারাপ খবর আছে। আমার দুটি দাসীর কোন খোঁজ পাচ্ছি না। রাতে তারা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু ভোর থেকে তাদের দেখা যাচ্ছে না।'

সম্রাট রিচার্ড চিন্তিত মনে বললেন, 'এটা তো খুব চিন্তার কথা! তারা কি মুসলমান?' তিনি চেহারায় দুশ্চিন্তা ধরে রেখেই বললেন, 'মুসলমান না হলে ওরা পালাবে কেন? আর যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে তো তারা পালাবেই। আমরা যেভাবে মার খাচ্ছি তাতে ওদের পালিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

'হ্যাঁ, তারা সিসিলির মুসলিম মেয়ে।' জিয়ান বললো, 'তবে তারা বিয়ের পর থেকেই আমার সাথে ছিল। বিয়ের পর সিসিলির শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েই আমি ওদেরকে পেয়েছিলাম।'

'মুসলমানের জন্ম যেখানেই হোক না কেন তাদের ঈমান, আবেগ ও চেতনা একই থাকে।' রিচার্ড বললেন, 'সে জন্যই আমরা এ জাতিটাকে এত বেশী ভয় করি। বলতে পারো, এ জন্যই তাদের পিছনে আমরা লেগে আছি যেন তারা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। ওরা এখানে এসে দেখতে পেলো, আমরা তাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। ফলে সুযোগ মতো তারা তাদের জাতির কাছে চলে গেছে।'

সম্রাট রিচার্ড সঠিক কথাই বলেছিলেন। ভাই-বোন যখন খৃষ্টান শিবিরে বসে এসব আলাপ করছিল সে সময় এই দুই মেয়ে বসা ছিল সুলতান আইয়ুবীর সামনে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

তারা সুলতানের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। তারা বলছিল, 'আমাদের কিছু কথা আছে যা শুধু সুলতান আইয়ুবীর কাছেই আমরা বলতে চাই।'

তাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করলে তারা সুলতান আইয়ুবীকে জানালো, 'আমরা সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই প্রতিপালিত হয়েছি। শৈশবেই আমরা রাজবাড়ীর কাজে নিযুক্ত হই।

রাজবাড়ীতেই আমাদের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলো পার হয়ে যায়। রাজকুমারী জিয়ান রাণী হয়ে আমাদের সম্রাটের কাছে এলে আমাদের চেহারা-সুরত ও শারীরিক গঠন দেখে আমাদের দু'জনকে রাণী জিয়ানের সেবিকা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

সিসিলিতে সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় খৃষ্টানদের কাছাকাছি ছিল। এই কারণে সেখানে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট সজীব ছিল। আমরা মেয়ে হলেও ধর্মের প্রতি ছিল আমাদের আন্তরিক টান ও ভক্তি।'

মেয়েরা সুলতানকে জানালো, 'জিয়ান যখন বিধবা হয়ে গেল তখন সম্রাট রিচার্ড তার বোনকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। জিয়ানের দাসী হিসাবে আমরাও চলে এলাম তার সাথে।

এখানে এসে দেখতে পেলাম, আমাদের প্রভুরা আমাদের ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করছে না বরং ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য নানারকম ষড়যন্ত্র করছে।

এতে আমাদের মন খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আমরা তখন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মাননীয় সুলতান! আপনিই বলুন, আমরা কি মুসলমান নই? আমাদের দেহে কি মুসলিম পিতার রক্ত বইছে না? তাহলে কি করে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে তাদের সাথে থাকতে পারি?

কাফেরদের বিরুদ্ধে এই জিহাদে আমরা শরীক হতে চাই। আপনি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন এবং আমাদের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

একহারা চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মেয়ে দুটি শুধু শারীরিক গঠনেই আকর্ষণীয় ছিল না, কথাবার্তায়ও যথেষ্ট চটপটে এবং বুদ্ধিমতি মনে হলো। সুলতান তাদের কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমরা ষড়যন্ত্রের কথা বললে, কি ধরনের ষড়যন্ত্রের খবর জানো তোমরা?'

তারা বললো, 'রাজকুমারী জিয়ান সম্রাট রিচার্ডের নব বধুকে বলছিল, 'সুলতান সালাহউদ্দিনের ভাই তকিউদ্দিনকে জালে আটকে ফেলেছি।'

'ওকে জালে আটকেছিস, নাকি নিজে তার জালে ধরা দিয়েছিস?'

'ওই একই কথা।' সে বললো, 'তকিউদ্দিনের অন্তরে আমার জন্য যেমন ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি তাকেও আমি ভালবেসে ফেলেছি।'

'তাহলেই মরেছিস। ওরকম শত্রুকে কেউ ভালবাসা দেয়? তোকে তো ভালবাসতে বলা হয়নি, ভালবাসার অভিনয় করতে বলা হয়েছিল।'

'তাই তো করছি। তকিউদ্দিনকে বলেছি, 'তুমি তোমার ধর্ম বদলে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো তাহলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।' জিয়ান বললো, 'তারপরে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করা ও জেরুজালেম পুনর্দখল করা কোন কঠিন কাজ হবে না।'

এই মেয়েরা সুলতানকে জানালো, তকিউদ্দিন ও জিয়ান এরা পরস্পর কখন কোথায় সাক্ষাত করে। তারা বললো, 'এই সংবাদ আপনাকে জানানোর জন্যই আমরা পালিয়ে এসেছি।'

সুলতান আইয়ুবী মেয়ে দুটিকে সসম্মানে দামেশকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

সুলতান আইয়ুবী এই মেয়েদের রিপোর্টকে সত্য বলেই বিশ্বাস করলেন। কিন্তু তিনি ভেবে পেলেন না, তার সহোদর ভাই কি করে তাকে ধোঁকা দিতে পারে?

তিনি তার প্রতিটি সেনাপতিকেই বিশ্বাস করতেন এবং তাদের উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু যখন তার ভাই তকিউদ্দিন ও দুই ছেলে আল আফজাল ও মালেক আল জাহের তার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন তার পেরেশানী আরো অনেক কমে গেল।

ইদানিং ক্রুসেড বাহিনীর পিছন থেকে যে আক্রমণ চালানো হয় তার নেতৃত্বে তিনি এদেরকেই পাঠিয়ে দেন। শরীর অসুস্থ থাকে বলে কদাচিৎ তিনি নিজে ময়দানে যান।

তকিউদ্দিনকে তিনি খৃস্টান সম্রাটদের সাথে আপোষ আলোচনার কাজে লাগাচ্ছিলেন। বিশেষ করে সম্রাট রিচার্ডের সাথে আলোচনা চলছিল তারই মাধ্যমে। কারণ সম্রাট রিচার্ড তার সাথে আলোচনা করতেই বেশী পছন্দ করেন।

আক্রার যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে ছিল। মুসলমানদের কঠিন অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল দিন দিন। কারণ বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চল থেকে সাহায্য আসতে শুরু করেছে।

মুজাহিদরা তাদের অভিযান ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর করছে। খৃস্টান সৈন্যদের মনোবল ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তকিউদ্দিনের আপোস আলোচনাও চলছে নিয়মিত। ইদানিং তিনি এই আলোচনার কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, সুলতান তাকে কমই কাছে পান। সুলতান জানতে পেরেছেন, ময়দানে যাওয়ার সময়ও তার খুব একটা হয়ে উঠে না।

সুলতানের শরীর খারাপ। ইদানিং যুদ্ধ চালাচ্ছে তার সেনাপতি ও ছেলেরা। তিনি শুধু সংবাদ পান, আজ অমুক দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা দুশমনের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে। পরে তারা অমুক দিক দিয়ে আক্রমণ করেছে।

সুলতান আইয়ুবীর ছেলেরা এখন ভালই কাজ দেখাচ্ছে। তারা পুরোপুরি যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। ময়দান এবং সেনা ক্যাম্পেই

এখন কেটে যায় তাদের বেশীর ভাগ সময়। বাপের সাথে দেখা করারও সময় পায় না তারা।

আক্রার প্রাচীর একস্থানে ক্রমাগত পাথর বর্ষণে ধ্বসে গিয়েছিল। খৃষ্টান বাহিনী সে পথে শহরে প্রবেশ করার জন্য অনেকবারই চেষ্টা করেছে। কিন্তু যতবারই তারা ওই পথে শহরে ঢুকতে চেয়েছে ততোবারই মুসলিম সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সরে আসতে হয়েছে তাদের।

আক্রবাসী প্রাণপণ শক্তি দিয়ে এমনি এক অভিযান রুখে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। উভয় পক্ষই মরিয়া হয়ে লড়ছে। ফলে হতাহত ও লাশের স্তুপ বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

সেই মুহূর্তে এক সেনাপতি পত্রবাহক কবুতরের পায়ে একটি চিঠি বেঁধে তাকে আকাশে উড়িয়ে দিল।

চিঠিতে সে লিখলো, 'আগামীকাল সকাল পর্যন্ত যদি আমাদের কাছে কোন সাহায্য না পৌছে আর আপনি বাইরে থেকে অবরোধ ভঙ্গ করতে না পারেন তবে শহরের পতন ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

কারণ শহরের শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করছে। শহর পুড়ে ধ্বংস হচ্ছে। সৈন্য সংখ্যা আর সামান্যই রয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরও অনেকে আহত। বাকীরা দীর্ঘ একটানা যুদ্ধে ক্লান্ত। লাশের মতোই এখন অসাড় হয়ে গেছে তাদের দেহগুলো।'

সুলতান আইয়ুবী চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন। তিনি তার সমস্ত

বাহিনীকে একত্রিত করলেন। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তিনি দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন।

সৈন্যদের বললেন, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! অনেক দিন হয়ে গেল আমরা এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়ে আছি। শহরের ভেতর যে সব ভাইয়েরা ছিল তাদের অনেকেই আল্লাহর দরবারে চলে গেছে। বাকীরা জীবিত থেকেও মৃতের মতোই। ওখানে আমাদের শিশুরা খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। যে কোন সময় শহরের পতন হতে পারে।

এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। ছয় লাখ খৃস্টান এসেছিল আমাদের দশ হাজার সৈন্য শেষ করতে। আমরা ওদের অর্ধেক সৈন্য খতম করে দিয়েছি।

এ রকম অসম যুদ্ধের নজির পৃথিবীতে এক বদরের যুদ্ধ ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবে না। সেদিন আল্লাহর সাহায্যে আল্লাহর সৈনিকরাই বিজয়ী হয়েছিল। আজো আল্লাহর সাহায্য আছে বলেই আমরা এখনো শত্রুর তিন লাখ সৈন্যকে খতম করার পরও টিকে আছি বহাল তবিয়তে। আমরা আল্লাহর আরো সাহায্য চাই এবং বিজয় চাই।

এসো আজ আমরা শপথ করি, বিজয় না নিয়ে আমরা কেউ আর ময়দান থেকে ফিরে আসবো না। হয় আমরা জয়ী হবো নইলে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চলে যাবো মালিকের দরবারে।

তাকে বলবো, 'তোমার প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে কেবল তোমাকেই রেখে এসেছি। আমরা তোমার

হুকুম অমান্য করিনি। বীর খ্যাতি লাভের জন্য নয়, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়, আমাদের সব প্রচেষ্টা ছিল তোমাকে খুশী করার জন্য। আমরা তোমার প্রতিশ্রুত জান্নাতের আকাঙ্খা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাজির হয়েছি। হে রাব্বুল আলামীন, তুমি আমাদের কবুল করো।'

তিনি বললেন, 'এখন আমরা সবাই দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বো। নামাজ পড়ে আমরা কেউ ক্যাম্পে ফিরে যাবো না, অজু অবস্থায় সবাই আল্লাহর সেই হুকুম বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যাবো, যেখানে তিনি মুমীনদের সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমরা হয় মারো অথবা মরো।' আমরা আমাদের মালিকের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আমরা মারবো অথবা মরবো। তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই আমাদের জন্য।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর জানবাজদের নিয়ে ময়দানে গেলেন। তিনি এমন প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন যা তার অতীতের সকল ইতিহাস অতিক্রম করে গেল।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস লেখে এমন কোন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেনি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত। মানুষের চোখ ইতিহাসের পাতায় এমন রক্তপাত দেখেনি কখনো। এই সংঘর্ষের নির্মমতা মানুষের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। ঐতিহাসিকরা শুধু লিখেছেন, 'মানুষের বিবেক এত রক্তের স্রোত কখনো কল্পনা করতে পারে না।'

বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ চলেছে সারা দিন। পশ্চিম আকাশে সেই

রক্তের আলপনা। টকটকে লাল রক্ত যেমন এক সময় কালচে রঙ ধারণ করে তেমনি সেই আলপনা মুছে কালো হয়ে গেল আকাশের রঙ। সেই কালো রঙ ছড়িয়ে পড়লো বিশ্ব চরাচরে। ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারের অতলে ডুবে গেল পৃথিবী। আক্রার শহর, খৃস্টানদের ক্যাম্প, মুসলিম তাবু সব তলিয়ে গেল সেই অন্ধকারে।

রাত নেমে এলো। মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত। আকাশে তারা নেই, চাঁদ নেই, আছে শুধু ভয়ংকর, ভীতিকর অন্ধকার। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হলো না।

সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতি ও সৈনিকদের বললেন, 'আমরা এখনো মারা যাইনি, বিজয়ও ধরা দেয়নি আমাদের হাতে। অতএব মুজাহিদরা! আজকের রাত আমাদের বিশ্রামের জন্য আসেনি। আমরা হয় জয়ের নিশান নিয়ে ফিরে যাবো শিবিরে, সেখানে বিশ্রাম নেবো পরম প্রশান্তিতে, নতুবা যুদ্ধ করতে করতে চলে যাবো অনন্ত শান্তির রাজ্যে।'

মুসলমান সৈন্যরা 'আল্লাহ আকবার' বলে কাঁপিয়ে তুললো যুদ্ধের ময়দান। এই আওয়াজে ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল খৃস্টান সৈন্যদের হৃদয়তন্ত্রীতে।

মধ্য রাত। সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধ করতে করতে এতটাই কাবু হয়ে গেলেন যে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন ঘোড়া থেকে। তাকে এনে তাবুতে শুইয়ে দেয়া হলো। যুদ্ধ চলতে লাগলো।

এই যুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। যখন সংজ্ঞা

ফিরলো দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। অসম্ভব ক্লান্তিতে হাত-পা অসাড় হয়ে আছে। তিনি দুর্বল কণ্ঠে প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন তা হচ্ছে, 'যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেছে?'

'না সুলতান! মুজাহিদরা এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি আহত, তাই আপনাকে সরিয়ে আনা হয়েছে ময়দান থেকে।'

ভোর। প্রভাতের আলোয় সুলতানকে দেখতে হলো এক বেদনাদায়ক দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখার আগে মরে গেলে ভাল হতো, কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা তো বান্দার জানা থাকার কথা নয়। তিনি দেখলেন, আক্রার প্রাচীরে খৃস্টানদের পতাকা উঠানো হচ্ছে।

খৃষ্টান সৈন্যরা প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে প্রবল বেগে প্রবেশ করছে শহরে। সেদিনটিও ছিল জুম্মা বার। তারিখটা ছিল ৫৮৭ হিজরীর ১৭ জমাদিউস সানি মুতাবেক ১২ জুলাই ১১৯২ সাল। আল মাশতুত ও কারাকুশ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি দিয়ে লড়াই করলেও তার সৈন্যরা এতটাই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, যুদ্ধ করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের। খৃস্টান সৈন্যরা বানের পানির মত শহরে প্রবেশ করা শুরু করলে হাতিয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো তারা।

কিছুক্ষণ পর। সুলতান আইয়ুবী এমন এক দৃশ্য দেখলেন যার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখতে পেলেন, ক্রুসেড বাহিনী প্রায় তিন হাজার মুসলমান বন্দীকে রশি দিয়ে বেঁধে শহরে বাইরে টেনে আনছে। তাদের মধ্যে সৈন্য এবং শহরের সাধারণ মানুষও ছিল।

তাদের এক স্থানে এনে দাঁড় করানো হলো। নিরস্ত্র তিন হাজার বনি আদম দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে মৃত্যুর আতঙ্ক। খৃস্টান সেনারা চারদিক থেকে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর। সুলতান আইয়ুবী ও মুসলিম সৈন্যরা কল্পনাই করতে পারেনি, ক্রুসেড বাহিনী এমন অমানবিক বর্বরতায় মেতে উঠতে পারে।

যখন নিরস্ত্র বন্দীদের উপরে ক্রুসেড বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন বাইরের মুসলমান সৈন্যরা কোন রকম নির্দেশ ছাড়াই সে সব খৃস্টান সৈন্যদের উপর মার মার কাট কাট করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ততোক্ষণে বন্দীদের অনেকেই শহীদ হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে আরো এক দফা প্রবল সংঘর্ষ হলো।

যুদ্ধের তান্ডবতা, আহতদের আর্ত চিৎকার, লাশের দুর্গন্ধ এসব দেখে ইতিমধ্যে সম্রাট রিচার্ডও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুলতান আইয়ুবী আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। বিগত যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী।

সম্রাট রিচার্ডের ওপর বিশ্ব খৃস্ট সম্প্রদায়ের আশা ও ভরসা ছিল, তিনি বিজয়ী না হয়ে ফিরবেন না। তারা তাকে দুঃসাহসী ও ব্যঘ্র হৃদয়ের অধিকারী জানতো।

কিন্তু আক্রার অবরোধ তার মনোবল একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হলেও যে বিভীষিকার মধ্য দিয়ে এই বিজয় অর্জিত হলো সেই বিভীষিকার কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

মাত্র কয়েক হাজার মুসলমানের এই বীরত্ব দেখে তিনি স্তম্ভিত

হয়ে গেছেন। এও কি সম্ভব? কয়েক হাজার সৈন্য বছরের পর বছর ঠেকিয়ে রেখেছে ছয় লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে! অকাতরে জান দিয়েছে।

সামান্যতম ভয়-ভীতিও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি! আক্রা জয় করতেই যদি এত মূল্য দিতে হয় তাহলে বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করতে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হবে? চিন্তাটা মনে এলেই তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কিন্তু জাতি তাকে বীর বলে জানে। নিজের আকাশচুম্বী মর্যাদাকে তিনি কি ধূলায় মিশিয়ে দিতে পারেন? না, পারেন না। যে বিজয় তিনি অর্জন করেছেন তাতে এখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই তার। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সাগরের উপকূল ধরে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। পথে তাকে আসকালান ও হায়ফার মত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বসতি পাড়ি দিতে হবে।

সুলতান আইয়ুবী সম্রাট রিচার্ডের মনোভাব বুঝতে পারলেন। রিচার্ড এসব শহর ও লোকালয় দখল করে সেখানে তার ক্যাম্প করবে। তারপর এই দুই শহরকে নিজের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে সেখান থেকে আক্রমণ করবে বায়তুল মোকাদ্দাস।

সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাসের জন্য আরও অনেক কোরবাণী দিতে রাজী ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, 'আসকালান দুর্গকে ধ্বংস করে দাও। এই শহর ও কেল্লাকে

ধ্বংসস্তুপে পরিণত করো!'

সুলতান আইয়ুবীর সেনাপতি ও উপদেষ্টারা এই ঘোষণা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। 'এতবড় শহর! এত মজবুত কেল্লা? সব গুড়িয়ে দেবো?'

সুলতান আইয়ুবী গর্জন করে বললেন, 'শহর আবার আবাদ করা যাবে। নতুন করে আবার গড়ে তোলা যাবে কেল্লা। মানুষ জন্ম হতেই থাকবে, প্রয়োজনে তারাই গড়ে নেবে নিজেদের কেল্লা ও আবাস। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এ মুহূর্তে বায়তুল মোকাদ্দাস রক্ষা করা।

ক্রুসেডদের বিশাল বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে। তারা এই কেল্লা ও জনপদকে নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিক তা আমি চাই না। তাদের আক্রমণ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসকে বাঁচাতে হলে এখন এ না করে উপায় নেই। বিকল্প কোন পথ থাকলে এমন হুকুম আমি দিতাম না।'

সবাই বুঝলো, সুলতান আইয়ুবী ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি যা বলছেন তাতে তার রণকুশলতাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই রণক্লান্ত সিপাহসালার যুদ্ধের আইন শৃংখলা ও রণকৌশল সম্পর্কে কতটা সজাগ ও সতর্ক এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি তাই আরেকবার প্রমাণ করলেন।

সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশে তার ক্ষুদ্র একটি কমান্ডো দল পিছু নিল খৃষ্টান বাহিনীর। তারা সুলতান আইয়ুবীর সেই বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত পথ ধরলো। তারা খৃষ্টান বাহিনীর ডানে

বায়ে ও পেছনে ঝটিকা আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ক্রুসেডারদের।

কমান্ডোরা হঠাৎ আবির্ভূত হতো এবং ছো মেরে গোশত তুলে নেয়ার মত যতটুকু পারতো ক্ষতি করে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

তাদের আক্রমণ হতো আকস্মিক ও এলোপাথাড়ি। সম্রাট রিচার্ডের বাহিনী তাদের ভয়ে অস্থির ও তটস্থ হয়ে গেল।

এই কমান্ডো বাহিনীর অধিকাংশ আক্রমণ হতো রাতে। কোন কোন রাতে একাধিকবার বা একাধিক জায়গায়ও এ আক্রমণ চালাতো কমান্ডোরা। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

এমনিভাবে ক্রুসেড বাহিনীর অগ্রগতি পদে পদে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাদের রসদপত্রও নিরাপদ ছিল না। রিচার্ড স্বসৈন্যে আসকালান গিয়ে সাময়িক বিরতি ও বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবলেন।

তিনি তার বাহিনীকে দ্রুততর করে যখন আসকালান গিয়ে পৌঁছলেন তখন আসকালানের অবস্থা দেখে তিনি সীমাহীন বিস্ময়ে কাতর হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন আসকালান কেল্লা ও শহর বলে কিছু নেই। সবই এক বিশাল ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে।

সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের বায়তুল মোকাদ্দাস রক্ষায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। শিশু এবং নারীদেরও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল অন্যত্র।

চরম বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন রিচার্ড। আর সামনে বাড়বেন

নাকি পিছিয়ে যাবেন ভাবলেন খানিক। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জেরুজালেমে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে মুসলিম বাহিনী।

আসকালানে রিচার্ডের আর বিশ্রাম নেয়া হলো না। তিনি বাহিনীকে যাত্রা করার হুকুম দিলেন। পথে তারা যতগুলো কেল্লা পেলো সেগুলোর সবই ছিল ধ্বংসবিধ্বস্ত।

সম্রাট রিচার্ড যতই এগিয়ে যাচ্ছিলেন ততোই তার মানসিক অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হতে লাগলো।

তিনি চিন্তা করে দেখলেন, মুসলমানরা এক অদ্ভুত জাতি। যে জাতি ধর্মের জন্য এতো কোরবাণী দিতে পারে তাদেরকে দুনিয়া থেকে উৎখাত করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

তিনি বুঝতে পারলেন, সামনে তার জন্য কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করা এতো সহজ হবে না।

আক্রা বিজয়ের পর ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে তার কথোপকথনের কথা স্মরণ করলেন সম্রাট রিচার্ড। ফ্রান্সের সম্রাট তাকে বলেছিল, 'বায়তুল মোকাদ্দাসের অভিযানে আমিও আপনার সাথে থাকবো।'

'তাহলে আমরা কি এখান থেকে একত্রেই রওনা দেবো?'

'তা বোধ করি ঠিক হবে না। আপনি আগে রওনা হয়ে যান কয়েকদিন পর আমি রওনা হই। এক সাথে রওনা হলে আইয়ুবীর বাহিনী আমাদের পিছু নিতে পারে। আর আলাদা রওনা হলে ওরা দ্বিধায় পড়বে। ভাববে, আমরা ওদের পিছু নিলে অবশিষ্ট খৃস্টান সৈন্যরা আমাদেরও পিছু নিতে পারে

তারা বর্তমান অবস্থায় এমন ঝুঁকি নেবে বলে মনে করি না।'

আজ সম্রাট রিচার্ড একটি দুঃসংবাদ শুনতে পেলেন। ফ্রান্সের সম্রাট অগাস্টাস আক্রা গে অব লুজিয়ানের হাতে তুলে দিয়ে নিজে ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি জেরুজালেম উদ্ধার অভিযানে আসবেন না। কারণ আক্রা দখল করতে গিয়ে তিনি নিজের প্রচুর ক্ষতি করে ফেলেছেন। আক্রার জয়ও সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে না। তিনি ক্ষতির পরিমাণ আর বাড়াতে চাচ্ছেন না বলেই দেশে ফিরে যাবেন। এ খবর সম্রাট রিচার্ডের মনোবল আরো ভেঙে দিল।

খৃস্টানরা আক্রা দখল করে নিয়েছিল বটে কিন্তু মুসলমানরা তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী আক্রা হাতছাড়া হওয়ায় খুব আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে যে তারই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল ঐতিহাসিকরা তা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। সুলতানের পরিকল্পনা ছিল তিনি শত্রুদের সামরিক শক্তি আক্রাতেই শেষ করে দেবেন। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। আক্রা জয় করে মোটেও তারা খুশী হতে পারেনি। আক্রাতে তাদের যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়েছে সে তুলনায় এটা কোন বিজয়ই ছিল না।

আক্রার অবরোধ না থাকায় সুলতান আইয়ুবী তার কমান্ডো বাহিনীকে আবার তার বিশেষ রণকৌশল গ্রহণ করতে বললেন। সেই পুরনো রণকৌশল, 'আঘাত করো আর পালিয়ে যাও।'

রাত হলেই শুরু হতো এ অতর্কিত আক্রমণ। ঐতিহাসিকরা

লিখেছেন, মুসলিম কমান্ডোরা রাতে ঝড়ের মত আঘাত হানতো ক্রুসেড শিবিরে। তারা ওদের পিছন থেকে বা পাশ থেকে আক্রমণ চালাতো। বহু ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে আবার পালিয়ে যেতো।

এভাবে তারা ক্রুসেড বাহিনীর কেবল জানমালের ক্ষতি করতো তা নয়, বরং রাতের পথ চলায় কমান্ডো ভীতি থাকার কারণে তাদের এক মাসের পথ পাড়ি দিতে লেগে যেতো তিন মাস। সুলতান আইয়ুবী ক্রুসেড বাহিনীকে পথে দেরী করিয়ে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করে তুলতে চাচ্ছিলেন।

'জিয়ান! কিছু একটা করো! পবিত্র ক্রুশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করো।' রিচার্ড তার বোন জিয়ানকে বললেন, 'তকিউদ্দিনকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাও। আমরা যুদ্ধ করে বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করতে পারবো না। তকিউদ্দিনকে নিয়ন্ত্রণে এনে আরেকটি রক্তাক্ত সংঘাত থেকে রক্ষা করো যিশুর পুত্রদের।'

'তুমি বলেছিলে তাকে ভালবাসার লোভ দেখাতে, যেনো সে ভালবাসার জন্য পাগল হয়ে যায়। আমি তোমাকে মা মেরীর কসম খেয়ে বলতে পারি, তার মনে আমি ভালবাসার যে ঝড় তুলে দিয়েছি তাতে সে দিওয়ানা হয়েই আছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, সে আমাকে প্রচন্ড ভালবাসে।'

জিয়ান বললো, 'এই অভিযানের মধ্যেও সে আমার সাথে দেখা

করেছে। সে যদি আমাকে পাগলের মত ভাল না বাসতো তবে কিছুতেই তা সম্ভব হতো না। কিন্তু তাকে যখনই বলি তুমি খৃস্টান হয়ে যাও, সে তখন বলে, 'না, জিয়ান, বরং তুমি মুসলমান হয়ে যাও।'

সে আমার শর্ত আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'তুমি বলছো, তুমি খোদার পথে আমাকে ডাকছো। আমি বলছি, 'আমি তোমাকে খোদার পথে ডাকছি।' তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আমরা উভয়ে একই পথে চলতে চাই। সুতরাং এসো আমরা এক কাজ করি, আমরা দু'জনেই এক সাথে আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরি।

তোমার ধর্ম অনেক পুরনো কিন্তু আমারটা টাটকা, নতুন। এমন তরতাজা ধর্ম রেখে পুরনো ধর্ম কেন আমরা আঁকড়ে ধরে রাখবো? আল্লাহর সর্বশেষ বাণীই হোক আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।' এবার বুঝো, সে কতটা ফাজিল হয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী তকিউদ্দিন ও তার দুই পুত্রকে কাছে ডেকে তাদের আদর করে বললেন, 'আমি তোমাদের মনে দুটো শব্দ গেঁথে দিয়ে যেতে চাই। শব্দ দুটো হলো, ইসলাম ও বায়তুল মোকাদ্দাস।'

তিনি তার সেনাপতিদের ডেকে বললেন, 'এতদিন আমরা আক্রার যুদ্ধ করিনি, যুদ্ধ করেছি বায়তুল মোকাদ্দাস প্রতিরক্ষার। আমি খৃস্টানদের আক্রায় ডেকে না নিলে এই দু'বছর ওরা কি করতো? ওরা কি বসে থাকতো? ফিরে যেতো

নিজেদের দেশে? কখনোই না। তারা সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো বায়তুল মোকাদ্দাসে। অতএব আমরা খৃস্টানদের অগ্রযাত্রা দু'বছরের জন্য পিছিয়ে দিতে পেরেছি। সেই সাথে আমরা ওদের শক্তি ও মনোবল শুষে নিয়েছি।'

তকিউদ্দিন একদিন সুলতানের সাথে একাকী দেখা করলেন। বললেন, 'সম্রাট রিচার্ড তার বোনকে আমার সাথে বিয়ে দিতে চান।'
'কিন্তু কোন শর্তে, কেন?' জানতে চাইলেন সুলতান।
'তার শর্ত বড় মারাত্মক ও ভয়ানক। তিনি আমাকে ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বলছেন।'
'তোমার কি ইচ্ছা? তুমি কি তোমার ধর্ম ত্যাগ করে রিচার্ডের বোনকে পেতে চাও?'
'আমি দুটোই পেতে চাই।'
'তবে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করো। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার সাথে তোমার বিয়েতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'
'আমি আপনার কাছে বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে আসিনি।' তকিউদ্দিন বললেন, 'আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি, আমি বিস্মিত হচ্ছি, রিচার্ডের মত বীর ও সাহসী যোদ্ধা কেমন করে এই চালাকী ও ধুর্তামীর পথ ধরতে পারে। তাকে আমি একজন সম্মানিত সম্রাট বলেই জানতাম। কিন্তু একজন সাহসী সম্রাট এতদূর নামতে পারে আমার ধারণা ছিল না। বিষয়টি আমি আপনাকে

জানাতে চাচ্ছিলাম।'

'কেন, তুমি কি রিচার্ডের বোনকে ভালবাস না?' সুলতান তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আমি স্বীকার করি তার বোনকে আমি ভালবাসি।' তকিউদ্দিন বললেন, 'কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি আমার ধর্মের সাথে কোন গাদ্দারী ও মুনাফেকী করবো না।'

'তাহলে তুমিও জেনে রাখো, সেও তার ধর্মের সাথে গাদ্দারী করবে না।'

'জাহান্নামে যাক সে।' তকিউদ্দিন বললেন, 'এই যুদ্ধে রিচার্ড কখনও বায়তুল মোকাদ্দাস দখলে নিতে পারবে না।'

তখন সুলতান আইয়ুবীর মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো হাসি। সেই হাসি বলছিল, মানুষের হৃদয় বড় অদ্ভুত জিনিস। ও যে কখন কাকে ভালবাসবে এই খবর দুনিয়ার কেউ বলতে পারে না। নইলে তুমি কি জানতে না, জিয়ান ভিন্ন ধর্মের এবং তোমার জাতির দুশমন, যার সাথে তুমি এখনো লড়াই করছো। তাহলে এ অবস্থায় তাকে ভালবাসতে গেলে কেন?

সুলতান আইয়ুবীর সাথে তকিউদ্দিনের এসব কথা হচ্ছিল তখন, যখন সম্রাট রিচার্ড বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরে সামরিক ঘাঁটি করে বসে আছেন। এখানে আক্রার চেয়ে বেশী রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা, কারণ খৃস্টান ও মুসলমান উভয়েই বায়তুল মোকাদ্দাসকে মনে করে তাদের ধর্মীয় তীর্থস্থান। পবিত্রভূমির জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত উভয় জাতি।

সম্রাট রিচার্ড এখানে এসেই যুদ্ধ করার পরিবর্তে আবার দূত

পাঠালেন আইয়ুবীর দরবারে। জানালেন, শর্ত মানলে তিনি যুদ্ধ করে অযথা লোক ক্ষয় করতে চান না।

সুলতান আইয়ুবী রিচার্ডের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে দূতকে বিদায় করে দিলেন। এর দু'দিন পর সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা খবর দিল, 'সম্রাট রিচার্ড ভীষণ অসুস্থ। এমন অসুখ, যে তাঁর জীবনের আশংকা রয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী রাতে তাবু থেকে বের হলেন এবং সম্রাট রিচার্ডের তাবুর দিকে যাত্রা করলেন। একমাত্র তকিউদ্দিন ছাড়া তিনি কোথায় যাচ্ছেন এ কথা কাউকে জানালেন না। তকিউদ্দিন সুলতানের অভিপ্রায় জেনে হেসে বললেন, 'অমুক স্থানে রিচার্ডের বোন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাকে সঙ্গে নিলে সম্রাটের কাছে সহজেই পৌঁছতে পারবেন।'

রাজকুমারী জিয়ান তার যেখানে দাঁড়ানোর কথা সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে যখন ঘোড়ার পদধ্বনি শুনলো দৌড়ে গেল ঘোড়ার কাছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, 'তুমি এসেছো তকিউদ্দিন?'

সুলতান আইয়ুবী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। জিয়ানকে বললেন, 'অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসো। আমি তকিউদ্দিন নই সালাহউদ্দিন।'

বিস্মিত জিয়ান বললো, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমার ভাই গুরুতর অসুস্থ। ভয় নেই, আমি তাকে একটু দেখতে চাই। তিনি হয়তো আমার পরিচয় জানতে পারলে আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন না। তাই

আমি তোমার সহযোগিতা চাই। আমাকে তুমি তার তাবুতে পৌঁছে দাও।'

বিস্মিত জিয়ান বললো, 'কিন্তু .....'

'না, কোন কিন্তু নেই। বললাম তো তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমি একা এবং নিরস্ত্র। সম্রাটের রক্ষী বাহিনীর ওপর তোমার আস্থা থাকা উচিত।'

জিয়ান আর কথা বাড়ালো না। বললো, 'চলুন।'

জিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে চাইলো। তিনি বললেন, 'না, তুমি ওখানেই বসে থাকো।'

জিয়ানকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে লাগাম ধরে নিরবে হেঁটে চললেন আইয়ুবী। গন্তব্য সম্রাট রিচার্ডের তাবু। জিয়ান কিছু বললো, কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তা বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'তোমার ভাষা আমার ভাই বুঝতে পারে, আমি বুঝি না।'

সুলতান আইয়ুবী সম্রাট রিচার্ডের তাবুতে প্রবেশ করলেন। রিচার্ড সত্যিই কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি সুলতান আইয়ুবীর সাথে কথা বলার জন্য দোভাষীকে ডেকে আনালেন। সুলতান আইয়ুবীই আগে কথা বললেন, 'আপনার বোনকে সামলান। আমার ভাই তার ধর্ম ত্যাগ করবে না। আর আপনি আমাকে বলুন, আপনার অসুখটা কি? আমি আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এসেছি।

আপনি মোটেই ভাববেন না, আপনার অসুখের খবর পেয়ে

আমরা কোন অন্যায় সুযোগ নেবো। যুদ্ধ আপাতত মুলতবী থাকবে। যতোদিন আপনি সুস্থ হয়ে না উঠবেন ততোদিন আমার সৈন্যরা আপনার উপর কোন আক্রমণ চালাবে না। আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন, পরে যুদ্ধ হবে।'

বিস্মিত সম্রাট রিচার্ড অবাক হয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। চোখে তার বিস্ময়ের ঘোর। বললেন, 'সালাহউদ্দিন, আপনি!'
তার বিস্ময়মাখা কণ্ঠ থেকে সহসা বেরিয়ে এলো, 'সত্যিই আপনি মহান! সালাহ্উদ্দিন! সত্যি আপনি এক অনন্য যোদ্ধা।'
তিনি তার অসুখের কথা বললেন। সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমাদের এলাকার অসুখ আমাদের এলাকার ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারে। আপনাদের এলাকার সৈন্যরা এখানে এসে অসুখে পড়লে ইংল্যান্ডের ডাক্তার কিছুই করতে পারে না। আমি আপনার চিকিৎসার জন্য আমার নিজস্ব ডাক্তারকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'
'সালাহউদ্দিন! আমরা একে অপরের রক্ত আর কতোকাল ঝরাবো?' রিচার্ড বললেন, 'এসো আমরা মিমাংসা ও আপোস করে ফেলি।'
'কিন্তু আমি বন্ধুত্বের বিনিময়ে সে মুল্য দিতে পারবো না যা তুমি চাচ্ছো।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তুমি রক্ত ঝরাতে ভয় পাচ্ছো, কিন্তু আমার জাতি বায়তুল মোকাদ্দাসের জন্য জীবনের শেষ কোরবাণী দিতে প্রস্তুত।'

সম্রাট রিচার্ডের তাবু থেকে ফিরে এলেন সুলতান আইয়ুবী। এসেই তার নিজস্ব ডাক্তারকে বললেন, 'সম্রাট রিচার্ড গুরুতর অসুস্থ। তুমি তাড়াতাড়ি ওখানে যাও।'

চিকিৎসক দেখলেন সম্রাটকে। তার রোগ আসলেই গুরুতর ছিল। দীর্ঘ দিন লেগে গেল সম্রাট রিচার্ডের সুস্থ হতে।

সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু সম্রাট রিচার্ডের তরফ থেকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও মিমাংসার নতুন প্রস্তাব এলো। তিনি সুলতানকে জানালেন, 'বায়তুল মোকাদ্দাস আমি মুসলমানদের ছেড়ে দিয়ে যাবো। কিন্তু আমার একটি দাবী আপনাকে রাখতে হবে, খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেম যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। আর সমুদ্র উপকূলের কিছু এলাকা খৃষ্টানদের ছেড়ে দিতে হবে।'

সুলতান আইয়ুবী এ শর্ত মেনে নিলেন। তার এ শর্ত মেনে নেয়ার পেছনে কারণ ছিল, সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী ক্রমাগত যুদ্ধ করে রণক্লান্ত। যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য শাহাদাত বরণ করায় সৈন্য সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার চাইতে সন্ধি করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

তিনি ভেবে দেখলেন, দুই বছরের অধিক সময় ধরে তার সৈন্যরা রাতদিন যুদ্ধ করেছে। তারা মানসিক দিক থেকে দুর্বল না হলেও শারীরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া তিনি নিজেও শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ ও ক্লান্ত। এ অবস্থায় খৃস্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দাবী ছেড়ে দিলে সেটা মুসলমানদের বিজয় বলেই গণ্য হয়। তাই তিনি সন্ধি প্রস্তাবে

সম্মতি দিলেন।
সম্রাট রিচার্ড মুসলমানদের নির্ভীকতা ও জাতীয় চেতনা দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওদিকে খবর যা পাচ্ছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে দেশের অবস্থাও ভাল না। বিরোধী পক্ষ ষড়যন্ত্র করছে এবং তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে। মোট কথা, ইংল্যান্ডের রাজ সিংহাসন বিপদের সম্মুখীন।
এই সন্ধি চুক্তি ১১৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। সম্রাট রিচার্ড ৯ অক্টোবর তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।

সম্রাট রিচার্ডের স্বদেশ যাত্রার পর সুলতান আইয়ুবী ঘোষণা করলেন, 'সৈন্যদের মধ্যে যারা হজ্জে যেতে ইচ্ছুক, তারা যেন নাম লিষ্ট করায়। তাদের সরকারী ব্যবস্থায় হজ্জের জন্য পাঠানো হবে।'
হজ্জ যাত্রীদের লিষ্ট তৈরী হয়ে গেল। দেরী না করে তাদের সবাইকে হজ্জে পাঠিয়ে দিলেন সুলতান। তার নিজেরও হজ্জ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জিহাদ তাকে সে সুযোগ দেয়নি।
তার কাছে সফরের খরচ পরিমাণ নিজস্ব অর্থ ছিল না। সরকারী খরচে যেতেও আপত্তি ছিল তার। তিনি বলেন, 'সরকারী অর্থ আমার নিজস্ব অর্থ নয়। এর থেকে আমার হজ্জের জন্য এক পয়সা নেয়াও আমি ঠিক মনে করি না।'
মিশরের লেখক মুহাম্মদ ফরিদুল ওয়াহেদিন লিখেছেন, 'মৃত্যুর

সময় সুলতান আইয়ুবীর মাত্র ৪৭ দিরহাম রৌপ্য ও এক ভরির মত সোনা ছিল। তার নিজস্ব কোন বাড়ীও ছিল না।'

সুলতান আইয়ুবী ৪ঠা নভেম্বর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে দামেশকে গিয়ে পৌঁছেন। তার মাত্র চার মাস পরেই তিনি তার মহান স্রষ্টার সাথে মিলিত হন।

দামেশকে পৌঁছার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার চাক্ষুস বর্ণনা লিপিবব্ধ করেছেন কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেখানে তিনি তার সন্তান ও পরিবার নিয়ে অবস্থান করেন।

সুলতান আইয়ুবী বাকী জীবন বিশ্রামের জন্য এ শহরকেই বেছে নিয়েছিলেন। তার সন্তানরা তাকে একান্তভাবে কাছে পেয়ে যারপরনাই খুশী। দামেশক ও আশপাশের লোকজন বিজয়ী সুলতানকে একনজর দেখার জন্য এসে ভীড় জমাতো তার মহলের সামনে। সুলতান আইয়ুবীও তার প্রতি জাতির এমন বিশ্বাস ও ভালবাসা দেখে অভিঁভুত। তিনি তার দুয়ার সর্ব সাধারণের সাক্ষাতের জন্য সারাক্ষণ খোলা রাখার হুকুম দেন।

সাক্ষাতের ব্যাপারে সবার জন্য ছিল সমান অধিকার। পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, আমীর, গরীব, শাসক ও শাসিত সকলেই সাক্ষাত লাভে উন্মুখ ছিল, তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না। দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরাও আসতেন সুলতানের সাথে দেখা করতে।

তিনি তাদের যথেষ্ট সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানাতেন। কবিরা

তার কৃতিত্ব ও গুণগান বর্ণনা করে লম্বা লম্বা কবিতা লিখে পেশ করতো তার দরবারে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় দিন রাত কোন সময়ই বিশ্রাম ও শান্তির ঘুমের সুযোগ ছিল না তার। এই বার যেন তিনি সামান্য বিশ্রামের সুযোগ পেলেন। তাছাড়া বয়সের কারণে তিনি শারীরিকভাবেও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

দৈহিক অবসাদ কাটাতে এবং দেহকে আগের মত চাঙ্গা করে তুলতে তিনি ভাই ও সন্তানদের নিয়ে মাঝে মাঝে হরিণ শিকারে বের হতেন। তার ধারণা ছিল, কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই তিনি আগের মতো পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। তখন তিনি মিশর চলে যাবেন। কিন্তু দামেশকের প্রশাসনিক ও সরকারী কাজ তাকে আটকে দিল।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বলেন, 'আমি সে সময় বায়তুল মোকাদ্দাসের উজির ছিলাম। একদিন দামেশক থেকে সুলতান আইয়ুবীর চিঠি পেলাম। তিনি চিঠিতে আমাকে দামেশকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি শিঘ্রই যেতে চাইলাম কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি ঝরায় রাস্তায় কাদা জমে গিয়েছিল। ফলে চিঠি পাওয়ার পরও দু সপ্তাহের বেশী সময় আমাকে বায়তুল মোকাদ্দাসেই থাকতে হলো।

২৩ মুহাররম শুক্রবার আমি দামেশকের দিকে রওনা হলাম। ১২ সফর মঙ্গল বার দামেশকে গিয়ে পৌঁছলাম। সে সময় সুলতান আইয়ুবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য বৈঠকখানায় কতিপয়

আমীর ও অফিসারবৃন্দ অপেক্ষা করছিলেন।

সুলতান আইয়ুবীকে আমার আগমন সংবাদ জানানো হলে শিঘ্রই তিনি আমাকে তার খাস কামরায় ডেকে নিলেন। তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তিন বাহু বাড়িয়ে মুসাফা করলেন ও উঠে কোলাকুলি করলেন। আমি তাকে খুব প্রশান্ত চিত্ত ও উৎফুল্ল হৃদয়ের অধিকারী দেখতে পেলাম। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম তার চোখে অশ্রু দেখে।

পরের দিন আবার তার খাস কামরায় গেলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাক্ষাতের জন্য বাইরের কামরায় কে কে বসে আছে?'

তিনি তার দরবারের খাদেমদের ইনচার্জ জামালুদ্দিন ইকবালকে বললেন, 'তুমি আমার পক্ষ থেকে ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। বলবে, ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য তিনি আজ দেখা করতে পারবেন না।'

তিনি আমার সাথে অনেক জরুরী কথা বললেন। আলোচনা শেষ হলে সেদিনের মত চলে এলাম আমি।

পরের দিন। তিনি আমাকে খুব ভোরে দেখা করার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন গেলাম তখন তিনি বাগানে শিশুদের সাথে খেলছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বৈঠকখানায় কোন লোক অপেক্ষা করছে?'

আমি বললাম, 'এক ফিরিঙ্গী দুত বসে আছে।'

সুলতান বললেন, 'তাকে এখানেই ডেকে নিয়ে এসো।'

তার ছোট শিশুটি সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু কোলের

বাচ্চাটি রয়ে গেল তার কোলে। সুলতান আইয়ুবী এই শিশুটিকে বুকে নিয়ে পরম প্রশান্তি পেতেন।
শিশুটি ফিরিঙ্গীকে দেখেই ভয়ে কেঁদে উঠলো। কারণ শিশুটি এমন অদ্ভুত পোশাকের লোক আগে কখনো দেখেনি।
সুলতান আইয়ুবী দুতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, 'তোমার এমন পোশাক ও চেহারা দেখে শিশুটি কাঁদছে।'
তিনি শিশুটিকে বুকের সাথে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে দুতকে বললেন, 'আজ আর আলোচনা সম্ভব নয়। তুমি আগামীকাল এসো।' এই বলে তিনি দুতকে বিদায় জানালেন।
মেহমান বিদায়ের পর তিনি বললেন, 'কি রান্না হয়েছে? এখানেই নিয়ে এসো।'
খুবই হালকা খাবার। সামান্য ক্ষীর ও রুটি। নাস্তা নিয়ে আসা হলো। তিনি অল্পকিছু খেলেন। আমিও তার সঙ্গে নাশতা করলাম। তিনি বললেন, 'কথা বলতেও অসুবিধা হয়। কারণ অজীর্ণ রোগে খুব দুর্বল হয়ে গেছি। হাজীরা কি এসে গেছে?'
আমি বললাম, 'রাস্তায় ভীষণ কাদা। সম্ভবত কাল এসে পৌঁছতে পারবে।'সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তাদের অভ্যর্থনা জানাতে যাবো।'
তিনি এক সামরিক অফিসারকে ডেকে বললেন, 'হাজীরা আসছেন। রাস্তা পরিস্কার করো।' আমি সুলতানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে এলাম।
পরের দিন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হাজীদের অভ্যর্থনা করতে বের হলেন। আমরাও তার পিছনে ঘোড়ায় সওয়ার

হলাম। তার ছেলে আল আফজাল এসে উপস্থিত হলো। জনসাধারণ বিজয়ী সুলতানকে একদম কাছ থেকে দেখার জন্য ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সকলেই তাঁর সাথে মুসাফা করতে চায়।

সুলতান আইয়ুবী জনগণের ভীড় ও চাপ দেখে সন্ত্রস্থ হয়ে উঠলেন। আততায়ী ও খুনী চক্র এর সুযোগ নিতে পারে। কারণ তিনি কোন দেহরক্ষী সঙ্গে আনেননি।

আমি জনতার ভীড় ঠেলে সুলতানের কাছে গেলাম ও তাকে বললাম, 'আপনি রাজকীয় পোশাকে বের হয়েছেন অথচ সঙ্গে কোন প্রহরী আনেননি। আমি খুবই ভয় পাচ্ছি। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়?'

তিনি আমার কথার গুরুত্ব দিলেন। চমকে আমার দিকে তাকিয়ে নিজেই ঘোড়া ঘুরিয়ে অন্য পথে কেল্লার দিকে চললেন। আমি ও আল আফজাল তার সাথে ছিলাম। আমরা ঝর্ণার পাশ দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলাম।

শুক্রবার সন্ধ্যা। সুলতান আইয়ুবীর শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। মাঝ রাতের জ্বর শুরু হলো।

২১ ফেব্রুয়ারী ১১৯৩। তিনি বার বার মুর্ছা যেতে লাগলেন। তার শরীর শীতল হয়ে আসতে লাগলো। সে সময় তার ছেলে আল আফজাল তার কাছে ছিল। তিনি জ্ঞান ফিরলেই বলতেন, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

আল আফজাল খবর দিল আমাকে। তিনি সারা রাত যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটালেন। আমরা কয়েকজন তাকে ঘিরে বসে

রইলাম। এতে তিনি মানসিকভাবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। ভোরে তার কষ্টের প্রকোপ কমে গেল। তিনি অনেক সুস্থ বোধ করলেন। আমি সেখান থেকে বিদায় নিতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আল আফজালকে সঙ্গে নিয়ে নাস্তা করে যাও।'

আমার সাথে কাজী আল ফজলও ছিলেন, তিনি অন্যখানে দাওয়াত আছে বলে চলে গেলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, সুলতান আইয়ুবীকে এ অবস্থায় রেখে যেতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমরা খাবার কামরায় গেলাম। সেখানে অনেক লোক। সকলের চোখেই অশ্রু টলমল করছে।

পরের দিন থেকে সুলতানের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যেতে লাগলো। কাজী আল ফজল প্রতিদিনই সুলতানকে দেখতে আসেন। সুলতানের অসুখ কিছু কম থাকলে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন, নইলে চোখ বন্ধ করে সুলতানের পাশে বসে থাকেন। সুলতানের চিকিৎসায় চারজন ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন। তাদের কারো মুখেই হাসি নেই। তাদের মুখের দিকে তাকালেই বুঝা যায় তারা কতটা নিরাশ।

আজ চারদিন ধরে সুলতানের শরীর খুব বেশী খারাপ। তার শরীরের যখন তখন অবস্থা।

ষষ্ঠ দিনে আমরা তাকে ধরে উঠালাম ঔষধ পান করানোর জন্য। পানি ঈষৎ গরম প্রয়োজন ছিল, তিনি পানি মুখে নিতে গিয়ে বললেন, 'বেশী গরম। একটু ঠান্ডা করে দাও।'

যখন পানি ঠান্ডা করে তার হাতে দেয়া হলো, তিনি বললেন, 'একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে।' তিনি রাগ বা অভিমান না করে শুধু

ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হে আল্লাহ, এরা কেউ আমার উপকার করতে পারবে না।'

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বলেন, 'আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল আল আফজাল। তার চোখে অশ্রু দেখে আমারও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। হায়, সমস্ত খৃষ্টান জগতকে কাঁপিয়ে দেয়া মানুষটি আজ এত অসহায়!

আমরা ডাক্তারের কামরায় গেলাম। কাজী আল ফজল আমাদের দেখে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, জাতি এক মহান নেতার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।'

অষ্টম ও নবম দিনে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন। তিনি আর পানিও পান করতে পারলেন না। এ খবর শুনে সমস্ত শহরে যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। শহরের সব মসজিদে সুলতানের আরোগ্যের জন্য দোয়া হতে লাগলো। মেয়েরা ঘরের কোণায় বসে জায়নামাজ ভিজিয়ে দিচ্ছিল আপন অশ্রুতে।

আমি ও কাজী আল ফজল রাতের প্রথম দিকে তার কাছে থাকতাম। শেষ রাতে থাকতো তার ছেলে ও পরিবারের লোকজন। আমরা লক্ষ্য করতাম, তিনি তাকাতে ও কথা বলতে পারছেন না।

শেষ রাতে যখন তার পরিবারের লোকজন তার কাছে থাকতো তখনো আমরা সেখান থেকে চলে যেতে পারতাম না। অবশিষ্ট রাত আমরা কামরার বাইরে বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিতাম।

কেউ তার কামরা থেকে বের হলে তার কাছ থেকে জেনে নিতাম তার অবস্থা।
বাইরের লোকজন আমাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারতো সুলতানের অবস্থা ভাল নয়। তারা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতো না।
দশ দিনের দিন ডাক্তার তার পেট পরিস্কারের ঔষুধ দিল। তাতে রোগ কিছুটা কমলো। তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং পানি পান করলেন। লোকজন যখন এ খবর শুনলো তখন সবার মনে কিছুটা আশার আলো দেখা গেল।
রাতে আমরা তার কাছেই বসে ছিলাম। ডাক্তার এলেন। তার নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, 'তার শ্বাসকষ্ট কমেছে। এখন তিনি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন।'
আমরা বললাম, 'তার শরীর খুব ঘামছে।'
তিনি বললেন, 'ঘাম বের হওয়া ভাল।'
আমরা আশ্বস্ত হয়ে বসে রইলাম।
এই অসুস্থতার ১১তম দিনে সুলতান আইয়ুবীর অবস্থা আবার দ্রুত খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তার দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন তার কামরায়।
তার জীবনী শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পুত্র আল আফজাল দেখলেন যে, সুলতানের আর বাঁচার আশা নেই। আল আফজাল সমস্ত আমীর ওমরাহ ও উজিরদের ডাকলেন। বললেন, 'আব্বার মৃত্যুর পর তার গড়া এই সালতানাত আবার টুকরো টুকরো

হয়ে যাক তা আমি চাই না। যে ঈমান ও একতার বন্ধনে তিনি আমাদের হৃদয়গুলোকে বেঁধে দিয়েছিলেন সেই বন্ধন অটুট রেখেই আগামী দিনগুলোতে আমাদের পথ চলতে হবে।

কোন রকম প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার অবকাশ তৈরী হোক তা আমি চাই না। তাই আমি আবেদন জানাচ্ছি, আব্বার স্থলে আপনারা নতুন একজনকে সুলতান মনোনীত করুন এবং আসুন আমরা সবাই শপথ বাক্য পাঠ করে তার আনুগত্য মেনে নেই।'

সবাই সর্বসম্মতভাবে আল আফজালকেই এ দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানালে তিনি নিজে প্রথমে হলফনামা পাঠ করলেন। তারপর সমস্ত আমীর, উজির, সেনাপতি সকলেই তার আনুগত্য মেনে নিয়ে হলফনামা পাঠ করলেন।

এ ছাড়া উপস্থিত সকলেই সুলতান আইয়ুবীর মৃত্যুর পর তার রাজ্যের একতা ও শক্তি অটুট রাখতে তার পুত্র আল আফজালের আনুগত্যের পক্ষে শপথ গ্রহণ করলো।

হলফ করার সময় আমীররা এমন দৃঢ় উক্তিও করলো, 'যদি আমাদের মধ্যে কেউ পরবর্তীতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করি তবে তার বিবি তালাক হয়ে যাবে। সে আইনত: শাসন ক্ষমতা ও দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।'

৩ মার্চ ১১৯৩ সাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা। অসুস্থতার আজ ১১তম দিন। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখন এ মহলেই অবস্থান করছেন। একটু আগে শপথনামা পাঠের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনভার সুলতান আইয়ুবীর বড় ছেলে আল আফজালের ওপর

ন্যস্ত হয়েছে। তিনি সুলতানের সারা জীবনের সঙ্গী কয়েকজনকে নিয়ে সুলতান যে রুমে শয্যাশায়ী ছিলেন সে কামরায় এলেন। তারা সবাই সুলতানের জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল। রাতে কাজী আবুল ফজল ও ইবনে জাকীকে ডাকা হলো। ইবনে জাকী বিজ্ঞ পন্ডিত ও আইনজ্ঞ লোক ছিলেন। জেরুজালেম বিজয়ের পর সুলতান আইয়ুবী মসজিদুল আকসায় প্রথম জুম্মার খোৎবা দেয়ার জন্য তাকেই নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ছিলেন দামেশকের প্রধান বিচারক।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বলেন, 'রাতে আল আফজাল আমাদের দু'জনকে মুমুর্ষ সুলতানের পাশে থাকতে বললেন। আমরা মানে আমি ও ইবনে জাকি। সারা রাত বাইরে সুলতানের সংবাদের জন্য জনগণ উৎকন্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ইমাম আবু জাফর সুলতানের শিয়রে বসে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন।'ইমাম আবু জাফর তার স্মতিচারণ করে বলেছেন, 'আমি সুলতানের শিয়রে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। তখন তিনি প্রায়ই বেহুশ। অনেকটা ঘোরের মধ্যে সময় কাটছিল তাঁর। আমি পবিত্র কোরআনের শুরু থেকে তেলাওয়াত আরম্ভ করলাম।'

৪ মার্চ ১১৯৩ তারিখের মধ্য রাত। ইমাম আবু জাফর বলেন, 'আমি ২২ পারার সুরা হজ্জের এই আয়াত পাঠ করছিলাম, 'আল্লাহই সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহই সত্য! তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন, তিনি ক্ষমতাশালী।' এ সময় সুলতান আইয়ুবী ক্ষীণ স্বরে কিছু বললেন। কিন্তু তিনি কি

বললেন আমি বুঝতে পারলাম না।
ফজরের আজান হলো। আমি কোরআন পাঠ বন্ধ করলাম। দেখলাম সুলতানের ঠোঁট সামান্য নড়ছে। কি বলছেন স্পষ্ট বুঝা গেল না, মনে হলো তিনি কালেমা পাঠ করছেন।
আমি তাকালাম সেখানে উপবিষ্ট কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ ও ইবনে জাকির দিকে। তারা ঝুঁকে এলেন সুলতানের মুখের ওপর। তারা টের পেলেন, আজান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান আইয়ুবী তার প্রভু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছেন। তারা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'
কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বলেন, মুসলিম বিশ্বে খেলাফায়ে রাশেদীনের পর কঠিন আঘাত পড়েছিল সুলতান আইয়ুবীর মৃত্যুতে। মানুষের ঢল নেমে এসেছিল রাস্তায়। শোকে তাদের অন্তরগুলো ছিল মুহ্যমান। মিছিলের পর মিছিল আসছিল মহলের দিকে। তাদের কণ্ঠে শোক ও মাতমের ধ্বনি। সবাই জোরে জোরে পড়ছিল কালেমায়ে শাহাদাত, 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ....'
জোহরের সময় সুলতান আইয়ুবীর মরদেহ গোছল করানো হয়। মৃতদেহ বাইরে আনা হলো কাফনের কাপড় পরিয়ে। সুলতানের কফিনটি যে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল সেটি দান করেছিলেন কাজী আল ফজল।
কফিন যখন মহলের চার দেয়ালের বাইরে আনা হচ্ছিল তখন

নারী, পুরুষ ও শিশুর কান্না ও আহাজারিতে আসমান বিদীর্ণ হচ্ছিল। দামেশকের স্বজনহারা মানুষের বুক ফাটা ক্রন্দন সহ্য করার মতো ছিল না।

নামাজে জানাজায় ইমামতি করলেন কাজী মহিউদ্দিন ইবনে জাকী। জানাজায় কত লোক হয়েছিল সে সংখ্যা নির্ণয় করার সাধ্য ছিল না কারো। শুধু অসংখ্য মানুষের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল দূর দূরান্ত পর্যন্ত।

নামাজে জানাজার পর তার মৃতদেহ বাগানের একটি ঘরে রাখা হলো সামান্য সময়ের জন্য। এখানে তিনি অসুস্থ অবস্থায় কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। আছর নামাজের আগেই সুলতান আইয়ুবীর মৃতদেহ কবরস্থ করা হলো।

সুলতান আইয়ুবীর একটি স্বপ্ন ছিল, ফিলিস্তিন বিজয়ের পর তিনি হজ্জের ফরজ আদায়,করবেন। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। ঐতিহাসিকরা বলছেন, এর কারণ ছিল অসুস্থতা ও আর্থিক অনটন। তার নিজস্ব অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বায়তুল মালের অর্থে হজ্জ করার ব্যাপারে তার আপত্তি থাকায় তাঁর এ স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। যে মর্দে মুজাহিদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে শত্রুর চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন করেছে হাজারও মুজাহিদ, যার হাতে সৈন্য ও সম্পদ তুলে দিয়েছিল মিশর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের শাসকবৃন্দ সেই সুলতান একটার পর একটা বিজয় ছিনিয়ে এনেও এতই নিঃস্ব ছিলেন যে, শেষ জীবনে হজ্জ করার প্রয়োজনীয় অর্থটুকুও তার হাতে ছিল না।

সম্রাট রিচার্ডের সাথে সুলতান আইয়ুবীর চুক্তির মেয়াদ ছিল

তিন বছর স্থায়ী। বিদায়ের সময় সম্রাট রিচার্ড সুলতান আইয়ুবীকে একটি চিঠি দিয়ে যান। তাতে তিনি বলেন, 'তিন বছর পর আবার আমি জেরুজালেম উদ্ধার করতে আসবো।' কিন্তু তারপরে শত শত বছর কোন খৃস্টান সম্রাট শত চেষ্টা করেও বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করতে পারেনি।

১৯৬৭ সালের জুন মাস। এই ঘটনার পৌণে আটশো বছর পর মুসলিম বিশ্ব আবার প্রত্যক্ষ করলো এক বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা। আরব ও মুসলিম বিশ্বের পারস্পারিক অনৈক্য ও দুর্বলতার ফলে পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস ও মসজিদুল আকসা আবার চলে গেল কাফেরদের হাতে। খৃস্টানদের মদদে তার কর্তৃত্ব নিল অভিশপ্ত ইহুদী জাতি।
মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা হারানোর বেদনায় মুষড়ে পড়লো মুসলিম বিশ্ব। আটশো বছর আগের ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি ঘটলো পবিত্র মাটিতে। মুসলমানদের রক্তে নতুন করে ভিজতে শুরু করলো ফিলিস্তিনের মাটি।
ইতিহাস আগের মতোই থাকলো। ইহুদী ও খৃস্টানরা একজোট হয়ে শুরু করলো বিংশ শতাব্দীর নতুন ক্রুসেড। কখনো ঘোষণা দিয়ে কখনো ঘোষণা ছাড়া সেই ক্রুসেড চলতেই থাকলো। আবারো শুরু হলো মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশের ষড়যন্ত্র।
চক্রান্তের ধরনেও কোন পরিবর্তন নেই। সেই অভিন্ন রূপ, অভিন্ন চালচিত্র। মুসলিম যুবকদের চরিত্র হননের সেই অভিন্ন

কৌশল। মুসলমানদের ঈমান ক্রয় করে গাদ্দার বানানোর জন্য আজো ব্যবহৃত হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ গন্ধম। নারীর মোহ, ক্ষমতার লোভ, গদির মায়া, সম্পদের আকর্ষণ, মদের নেশা কি নেই সেখানে?

শিয়া-সুন্নীর বিরোধ, নানা রকম ফেরকা ও উপদল সৃষ্টি, ভৌগলিক জাতীয়তার উন্মাদনা জাগানো এবং এ ধরনের নানা উপায় অবলম্বন করে মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে খন্ডবিখন্ড করার চক্রান্ত, সেই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের বিষাক্ত ছোবল, সবকিছুই পরিবেশন করা হচ্ছে আরো উন্নততর পদ্ধতিতে, আধুনিক্ক প্রযুক্তির উৎকর্ষতার নিত্য-নতুন মোড়কে।

সভ্যতার সবচে বড় ট্রাজেডি, যে পাশবিক শক্তি পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করছে তার কণ্ঠেই শোনা যাচ্ছে মানবতার জন্য অদ্ভুত মায়াকান্না। এই ষড়যন্ত্র বা আধুনিক ক্রুসেড এখন আর কেবল ফিলিস্তিন নয়, কেবল আরব বিশ্ব নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে ছোবলের পর ছোবল হেনে চলেছে। পৃথিবী এখন এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

এ বিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে কেবল মুসলমান নয় মানবতার স্বপক্ষ শক্তিকে আবার পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। মানবিক শক্তিকে আবার নামতে হবে সভ্যতা ও মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য সমরে।

এ লড়াই হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার লড়াই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হবে যুদ্ধের হাতিয়ার। রুখতে হবে পাশবিক সংস্কৃতির সর্বনাশা ছোবল। মানুষের মনে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষ ও

মানবতার প্রতি মমত্ববোধ, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সৌরভ।

আজ শুধু ফিলিস্তিন নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নির্যাতীত মানবাত্মা ক্রন্দন করছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত এক মহান নেতার জন্য। যার বুক ভরা থাকবে স্নিগ্ধ ভালবাসার কোমল মায়ায়। যার হৃদয়ের আকাশ জুড়ে থাকবে মহত্বের সুউচ্চ মিনার। অন্তর জুড়ে থাকবে অনন্ত সুবাসিত পুষ্প-পরাগ।

কিন্তু সেই নেতা তখন আসবেন যখন মানবতার স্বপক্ষ শক্তি আবার যুথবদ্ধ হবে। ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে রাসূলের প্রেমিকরা। সব নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও কুপমন্ডুকতা মাড়িয়ে সত্যকে ধারন করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে আলোর পাখীরা।

জমিন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত যেমন বীজ ফেললেও সেই জমিতে ফসল ফলে না, তেমনি মানবতার স্বপক্ষ শক্তির হৃদয়ে যতোক্ষণ সেই নেতাকে ধারন করার আকুতি না জাগবে ততোক্ষণ সেই মহান নেতার আবির্ভাব কি করে আমরা আশা করতে পারি? তাইতো সভ্যতার স্বপক্ষ শক্তি আবার দাঁড়িয়েছে পাশবিকতার বিরুদ্ধে। মানবতার স্বপক্ষে উচ্চারিত হচ্ছে উচ্চকিত জনকল্লোল। একদিন এই জনরবে হারিয়ে যাবে আমাদের আত্মার ক্রন্দন।

জানি, একদিন নতুন আইয়ুবীর আগমন ঘটবে রক্তাক্ত বিশ্বের কান্না থামাতে। কিন্তু কে হবেন সে আইয়ুবী? এখন তিনি

কোথায়? কার ঘরে? তার বাহিনীতে থাকবে কি আমার নাম? আমার সন্তানের? জানি না।

শুধু জানি, তিনি আসবেন। তিনি আসবেন সত্যের মশাল হাতে। যে মশালের আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানুষের হৃদয়। ঘুচে যাবে অন্তরের অনন্ত অন্ধকার। চাঁদ উঠবে। ফুল ফুটবে। প্রেমের সুবাসে আবার সুবাসিত হবে পৃথিবীর মায়াকানন।

##

ক্রুসেড-৩০
মহাসমর
আসাদ বিন হাফিজ